বাংলাদেশে কয়েদি জীবনের নাট্যিক রূপায়ণ: কারানাট্যের নন্দনতত্ত্ব

Theatrical representation of the life of prisoners in Bangladesh: The aesthetics of Theatre in prison

রাগীব নাঈম

এম.ফিল. গবেষণাপত্র

থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ

কলা অনুষদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা, বাংলাদেশ

২০২৫

Dhaka University Institutional Repository

অনুমোদনপত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের অধীনে এম.ফিল থিসিস হিসেবে রাগীব নাঈম (রেজিস্ট্রেশন নং: ১৫৭ পরীক্ষার রোল: ০২, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৯-২০) কৃত "বাংলাদেশে কয়েদি জীবনের নাট্যিক রূপায়ণ: কারানাট্যের নন্দনতত্ত্ব" শিরোনামের গবেষণা কর্মটি আমার সরাসরি তত্ত্বাবধানে সম্পন্নকৃত একটি মৌলিক গবেষণা। আমি উক্ত গবেষণাটি একাডেমিক ডিগ্রি অর্জনের নিমিত্তে জমাদানের জন্য অনুমোদন করছি।

(ড. মো. ইস্রাফীল)

অধ্যাপক

থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি রাগীব নাঈম (রেজিস্ট্রেশন নং: ১৫৭ পরীক্ষার রোল: ০২, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৯-২০) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের অধীনে এম.ফিল থিসিস হিসেবে কৃত "বাংলাদেশে কয়েদি জীবনের নাট্যিক রূপায়ণ: কারানাট্যের নন্দনতত্ত্ব" শিরোনামের গবেষণা একাডেমিক ডিগ্রি অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপন করছি। উক্ত গবেষণাটি ড. মো. ইস্রাফীলের সরাসরি সরাসরি তত্ত্বাবধানে সম্পন্নকৃত একটি একক ও মৌলিক গবেষণাকর্ম।

(রাগীব নাঈম)

এম.ফিল (২য় বর্ষ)

পরীক্ষার রোল: ০২

রেজিস্ট্রেশন নং: ১৫৭

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৯-২০

থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের অধীনে আমার কৃত এম.ফিল গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে বিভাগের জেষ্ঠ্য অধ্যাপক ড. মো. ইস্রাফীল-এর নিবিড় তত্ত্বাবধান ও আন্তরিক সহযোগিতাকে সর্বাগ্রে স্বীকার করছি। তাঁর দিকনির্দেশনায় ভর করে বর্তমান গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

একই প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাই এম.ফিল শ্রেণির কোর্স শিক্ষক বিভাগের অধ্যাপক ওয়াহিদা মল্লিক ও অধ্যাপক ড. আহমেদুল কবির-এর প্রতি। তাঁদের গবেষণা সংশ্লিষ্ট আন্তরিক পাঠদান আমাকে ঋদ্ধ করেছে। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ড. শাহমান শাহরিয়ার মৈশান-এর প্রতি। তাঁর সাহচার্য আমাকে সৃজনশীল ও অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণ ও কারানাট্যের দ্বারা সংশোধনের মানবিক প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

বর্তমান গবেষণার প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ, কয়েদিদের সাথে যোগাযোগ, কারাগার পরিদর্শন, তথ্য বিশ্লেষণে সূক্ষ্মতা তৈরি, একাডেমিক কার্যক্রমে সহায়তাসহ বিভিন্ন আনুষাঙ্গিক সহযোগিতার জন্য বিভাগের চেয়ারম্যান, সকল শিক্ষক, কর্মকতা-কর্মচারী, বিভাগের অগ্রজ ও অনুজদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

Dhaka University Institutional Repository

নির্যাস

বর্তমান গবেষণাটিতে সমাজবিজ্ঞান ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে বাংলাদেশের কারাগার ব্যবস্থার প্রামাণ্য চিত্র উপস্থাপনপূর্বক অপরাধ প্রশমন ও অপরাধীর মনস্তত্ত্বে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ণের লক্ষ্যে কারানাট্যের আঙ্গিক ও নন্দনতত্ত্ব অনুসন্ধান করা হয়েছে। গবেষণার প্রথম অধ্যায়ে বাংলাদেশের কারাগারসমূহে অন্তরীণ কয়েদি ও হাজতিদের এবং তাদের পরিবার-স্বজনদের প্রাক-কারাজীবন, কারাকালীন ও কারা-পরবর্তী জীবনের সামাজিক-রাজনৈতিক-প্রশাসনিক-বিচারিক-মনস্তাত্ত্বিক-শারীরবৃত্তিক সংকটসমূহ অন্বেষণ ও বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করা হয়েছে। উক্ত গবেষণার দ্বিতীয় অধ্যায়ে, বিশ্বব্যাপী পরিচালিত বাছাইকৃত ৩টি কারানাট্য মডেলের আঙ্গিক-কর্মপ্রক্রিয়া-প্রভাব বিশ্লেষণপূর্বক অপরাধীর মনস্তত্ত্বের ইতিবাচক পরিবর্তন ও অপরাধ প্রশমনে কারানাট্যের কার্যকারিতা অনুসন্ধান করা হয়েছে। এবং তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের কারাগার ব্যবস্থা ও বন্দীদের সংকট এবং বিশ্ব কারানাট্যের আঙ্গিক-কর্মপ্রক্রিয়া বিবেচনায় বাংলাদেশের কারাগার সমূহে পরিচালনের উপযোগী কারানাট্যের আঙ্গিক ও নন্দনতত্ত্ব তালাশ করা হয়েছে। সবিশেষ, বর্তমান গবেষণার উপসংহার অংশে অপরাধীর মনস্তত্ত্বের ইতিবাচক পরিবর্তন ও অপরাধ প্রশমনে কারাবন্দী দর্শককে কর্তাস্বত্তায় রূপান্তরের লক্ষ্যে দর্শক ও অভিনেতা পারস্পরিক সংলাপ নির্ভর কারানাট্য নির্মাণের প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছে।

মূখ্যশব্দ: বাংলাদেশ কারাগার, কারানাট্য, কারানাট্যের নন্দনতত্ত্ব, কারাবন্দী, সংলাপ নির্ভর নাট্যভাষা, পেডাগোজি অফ দ্য অপ্রেসড, থিয়েটার অফ দ্য অপ্রেসড।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

অনুমোদনপত্র ii

ঘোষণাপত্র iii

কৃতজ্ঞতা স্বীকার iv

নির্যাস v

ভূমিকা ১

গবেষণার ক্ষেত্র ১

সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা ২

কারাগার প্রসঙ্গে ২

কারানাট্য প্রসঙ্গে ৬

বাংলাদেশের কারানাট্য প্রসঙ্গে ৯

গবেষণা সমস্যা ৯

গবেষণা প্রশ্ন ১০

গবেষণা পরিধি ১০

গবেষণা পদ্ধতি ১০

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ১১

তাত্ত্বিক কাঠামো ১২

গবেষণার নৈতিকতা ১৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়: বাংলাদেশের কারাগার ব্যবস্থার বর্তমান চিত্র.....১৮

১.১ বাংলাদেশের কারাগার সমূহের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের চিত্র ১৮

রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগার.....১৮

বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগার.....২০

পটুয়াখালী জেলা কারাগার.....২২

বরগুনা জেলা কারাগার.....২৫

ভোলা জেলা কারাগার..... ২৬

পিরোজপুর জেলা কারাগার.....২৮

দিনাজপুর জেলা কারাগার.....২৯

কুড়িগ্রাম জেলা কারাগার..... ৩০

নীলফামারী জেলা কারাগার..... ৩২

ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগার..... ৩২

গাইবান্ধা জেলা কারাগার.....৩৪

কক্সবাজার জেলা কারাগার.....৩৪

১.২ কারাগারের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ও সামগ্রিক পরিবেশ বিষয়ে কারাবন্দিদের অভিজ্ঞতা..... ৩৯

কারাবন্দীর অভিজ্ঞতা- ১..... ৩৯

কারাবন্দীর অভিজ্ঞতা- ২.....৪৯

কারাবন্দীর অভিজ্ঞতা- ৩.....৫১

Dhaka University Institutional Repository

কারাবন্দীর অভিজ্ঞতা- ৪.....৫৪

কারাবন্দীর অভিজ্ঞতা- ৫.....৫৭

কারাবন্দীর অভিজ্ঞতা- ৬.....৫৮

কারাবন্দীর অভিজ্ঞতা- ৭.....৫৯

কারাবন্দীর অভিজ্ঞতা- ৮.....৬০

কারাবন্দীর অভিজ্ঞতা- ৯.....৬১

কারাবন্দীর অভিজ্ঞতা- ১০.....৭২

কারাবন্দীর অভিজ্ঞতা- ১১.....৮২

কারাবন্দীর অভিজ্ঞতা- ১২.....৮৭

কারাবন্দীর অভিজ্ঞতা- ১৩.....৯১

কারাবন্দীর অভিজ্ঞতা- ১৪.....৯২

কারাবন্দীর অভিজ্ঞতা- ১৫.....৯৪

কারাবন্দীর অভিজ্ঞতা- ১৬.....৯৫

কারাবন্দীর অভিজ্ঞতা- ১৭.....৯৬

কারাবন্দীর অভিজ্ঞতা- ১৮.....৯৮

১.৩ কেন্দ্রীয় ও জেলা কারাগারের সাবেক কারাভোগীদের অংশগ্রহণে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন.....৯৯

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন- ১.....৯৯

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন- ২.....১০১

Dhaka University Institutional Repository

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন- ৩ ..... ১০৪

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন- ৪ ..... ১০৭

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন- ৫ ..... ১১০

দ্বিতীয় অধ্যায়: বিশ্বব্যাপী প্রচলিত কারানাট্যের মডেল পর্যালোচনা ১১৩

দক্ষিণ আফ্রিকা মডেল ১১৩

ব্রাজিল মডেল ১১৪

চীন মডেল ১১৫

তৃতীয় অধ্যায়: কয়েদি জীবনের নাট্যিক রূপায়ন: কারানাট্যের নন্দনতত্ত্ব অন্বেষণ ১১৭

উপসংহার ১২০

সহায়ক গ্রন্থাবলী ১২২

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

গবেষণার ক্ষেত্র

কারানাট্য গবেষক ও নাট্যনির্দেশক এগনেক্স উইলকক্স (২০০৫) তার কারাগার পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন যে, "কারাগার হলো দমন এবং কর্তৃত্ব ফলানোর একটি জায়গা" (পৃ. ১১৮)। এইধরণের দমনমূলক কারাগার ব্যবস্থা অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি করে মর্মে কারানাট্য গবেষক মাইকেল ডি ম্যাকমিশ (২০০৪) বলেন, এই ধরণের কারাব্যবস্থা অপরাধ প্রশমনে কেবল ব্যর্থই নয়, বরং দণ্ডপ্রাপ্তকে 'অপরাধীকে ট্যাগ' প্রদানের মাধ্যমে অপরাধের প্রবণতা আরো বাড়িয়ে তোলে। ম্যাকমিশ আরো বলেন, কারাগারে কারাবন্দিদের অপরাধী মনোভাব প্রশমনে অকার্যকর ও অপ্রয়োজনীয় কায়িক শ্রমে যুক্ত নিযুক্ত করা এবং 'একঘরে' করে রাখার যেই 'অস্বাভাবিক যাপন ব্যবস্থা' চাপিয়ে দেওয়া হয়, তা অপরাধ প্রশমনের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে। অপরাধ প্রশমন এবং অপরাধীর মনোভাবের ইতিবাচক পরিবর্তনে সাংস্কৃতিক চর্চা তথা নাট্যচর্চা কার্যকর উপায় হতে পারে উল্লেখ করে কারানাট্য গবেষক মাইকেল বালফোর (২০০৪) বলেন, "কারাবন্দিদের পুনঃশিক্ষণ, পুনঃসামাজিকীকরণ এবং পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কারানাট্য একটি কার্যকরী উপাদান বা প্রক্রিয়া হিসেবে ক্রিয়া করতে সক্ষম" (পৃ. ২)। প্রসঙ্গত, দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে সাংবাদিক রোজিনা ইসলাম (২০২৩) বলেন, "কারা অধিদপ্তরের ৫ নভেম্বরের [২০২৩] হিসাবে, দেশে ৬৮টি কারাগারের বন্দী ধারণক্ষমতা ৪৩ হাজারের কম। তাতে রয়েছেন প্রায় ৮৮ হাজার বন্দী" (প্যারা. ১)। যা ধারণক্ষমতার দ্বিগুণেরও বেশি। এছাড়াও, বাংলাদেশ কারাগারের নিজস্ব ওয়েবসাইটে জাতীয় দিবসসমূহ ব্যতিরেকে কারাবন্দিদের অন্যকোন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হওয়ার কোন তথ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। সঙ্গত

Dhaka University Institutional Repository

কারণে বাংলাদেশের কারাগার ব্যবস্থা এবং অপরাধ প্রশমনে কারানাট্যের কার্যকারিতা অনুসন্ধানকে বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা

কারাগার প্রসঙ্গে

প্রাচীন গ্রীসে অপরাধীদের শাস্তি প্রদানের নেপথ্যে অপরাধীদের সংশোধনের ধারণা ছিল উল্লেখ করে গবেষক ডেভিড কোহেন (২০০৫) বলেন, "সে সময় অপরাধ সংগঠিত করার ফলশ্রুতিতে যারা নির্দিষ্ট পরিমাণ জরিমানা দিতে পারত না, মূলত তাদের কারাদণ্ড দেওয়া হতো। দেখা যেতো, কেবল মাত্র দরিদ্র এথেনিয়ানরা তাদের জরিমানা পরিশোধ করতে পারত না" (পৃ. ১৮৬)। তিনি আরো বলেন, মূলত রোমানরা প্রথম কারাদণ্ডকে শাস্তি হিসেবে বিবেচনায় নেয়। বাইবেলে বর্ণিত আখ্যানে যোসেফকে প্রাচীন মিশরে বন্দি করে রাখার স্থানকে উদ্দেশ্য করে গবেষক ফারিয়া পুষ্প (তারিখহীন) বলেন, এটি এমন একটি জায়গা যেখানে রাজার বন্দীদের আবদ্ধ করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কারাগারের উত্থান প্রসঙ্গে কোহেন (২০০৫) বলেন, উনিশ শতক নাগাদ, বন্দীদের আবাসনের জন্যে কারাগারগুলো তৈরি করা হয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে অপরাধ থেকে বিরত রাখা। বিভিন্ন অপরাধে দোষী সাব্যস্তদের দণ্ডাদেশ দিয়ে কারাগারে পাঠানো হত এবং তাদের স্বাধীনতা কেড়ে নেয়া হত। কারাগারে বন্দীদের শারিরীক ও মানসিক উভয় ধরণের শাস্তিই প্রদান করা হতো।

তবে বর্তমান সময়ে লিবারেল-জুরিসপ্রুডেন্সের উত্থানের পর কারাগারকে শুধু শাস্তি দেওয়ার স্থান হিসেবে বিবেচনা না করে সংশোধনাগার হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। কারাগারে অপরাধীর অপরাধ প্রবৃত্তির দমন বা সংশোধন প্রসঙ্গে মার্কিন আইনজীবী ও গবেষক ডেভিড উইলিয়াম লুইস (২০০৯) বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

> Theories of rehabilitation argue that the purpose of imprisonment is to change prisoners' lives in a way that will make them productive and law-abiding members of society once they are released. The idea was promoted by 19th century reformers, who promoted prisons as a humane alternative to harsh punishments of the past. Many governments and prison systems have adopted rehabilitation as an official aim. In the United States and Canada, prison agencies are often referred to as "Corrections" services for this reason. (পৃ. ৬)

রাষ্ট্র বনাম ঐশি রহমান মামলায় বাংলাদেশের উচ্চ আদালত ফৌজদারি অপরাধের শাস্তি হিসেবে চারটি দর্শনের উল্লেখ করেছেন। দর্শনগুলো হলো :

(১) প্রতিশোধ পরায়ণ (Retribution Philosophy),

(২) অপরাধ প্রতিরোধ মূলক (Deterrent Philosophy),

(৩) অপরাধ নিবারণ মূলক (Preventive Philosophy) ও

(৪) অপরাধ সংশোধন মূলক (Reformative Philosophy)

Retributive philosophy বা প্রতিশোধ পরায়ণ দর্শন বেশ পুরনো। মূলত প্রাচীন সমাজে অপরাধী কেবল মাত্র অপরাধ করেছে বলেই তাকে শাস্তি দেয়া হতো। এন. ভি. পরাঞ্জপী (১৯৯৬) বলেন যে,

> প্রতিশোধ পরায়ণ দর্শনের মূল বক্তব্য হলো চোখের বদলে চোখ এবং রক্তের বদলে রক্ত। জেলখানার এই শাস্তিতে অপরাধীকে নতুন করে বাঁচতে দেয়ার সুযোগের কথা চিন্তা করা হয় না বরং সে অপরাধ করেছে বলে তাকে শাস্তি দেওয়া মুখ্য হয়ে ওঠে। প্রতিশোধ পরায়ণ দর্শন অপরাধীর প্রতি ব্যক্তিগত,

Dhaka University Institutional Repository

> সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিশোধের পথ প্রশস্ত করলেও, সামাজের জন্য অপরাধ থেকে কোনো সুরক্ষা বলয় তৈরিতে ভূমিকা রাখে না; কেননা শাস্তির মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায় না। (পৃ. ১৪৫)

অমানবিক ও অবৈজ্ঞানিক হওয়ার পরেও শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিশোধ পরায়ণ দর্শন এখনো কার্যকর রয়েছে। সু তিতাস রেইড (১৯৯৭) উদ্ধৃত করেন যে, "হাবিল-কাবিলের পৌরাণিক গল্পের মত, এই দর্শনে অপরাধীকে তার অপরাধের জন্য শাস্তি প্রদান করা মূখ্য হয়ে ওঠার কারণ হলো— শাস্তি প্রদানকারী শাস্তি প্রদানকে তার নৈতিক কর্তব্য মনে করে থাকে" (পৃ. ৮২)।

অন্যদিকে, অপরাধ প্রতিরোধ মূলক বা Deterrent philosophy'র মূল বক্তব্য হলো সমাজের শাস্তির ভয় থাকলে অপরাধীরা অপরাধ করবে না। এই দর্শনের মূল ভিত্তি হলো হেডোনিজম। এই দর্শন বলতে চায় প্রতিটি মানুষই পেইন এবং প্লেজার হিসাব যে কোন কাজ করে থাকে। অ্যান্থনি ইলিস (২০০৩) বলেন যে,

> যদি কোন অপরাধ করে কেউ এত বেশি আনন্দ পায় এবং তা যদি নির্ধারিত শাস্তির ভয়ের চেয়েও বেশি হয় তবে সমাজে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে যদি শাস্তির মাত্রা বাড়িয়ে দেয়া হয় এবং অপরাধের আনন্দের চেয়ে শাস্তির ভয় বেশি হয় তবে সমাজে অপরাধের মাত্রা হ্রাস পাবে। (পৃ. ৩৪২-৩৪৩)

অপরাধ নিবারনমূলক দর্শন বা Preventive Philosophy'র আলাপ হলো অপরাধ সংগঠিত হবার আগেই অপরাধ নিবারণ করতে হবে। আমাদের ফৌজদারি আইন মূলত নিবারণ মূলক দর্শনের ফলাফল। প্রতিশোধ পরায়ণ দর্শন কিংবা অপরাধ প্রতিরোধ মূলক দর্শন থেকে নিবারনমূলক দর্শনের পার্থক্য হলো –

Dhaka University Institutional Repository

নিবারণ মূলক দর্শন শাস্তির আধিক্যের দিকে মনোযোগ না দিয়ে শাস্তি নিশ্চিতের দিকে বেশি মনোযোগ দেয়। পূর্বে আলোচিত দুটি দর্শনের চেয়ে নিবারণ মূলক দর্শন অধিক মানবিক ও সময়োপযোগী। এই দর্শনটি কারাগারের বর্তমান অবস্থার পেছনে সবচেয়ে দায়ী। মনে করা হয়ে থাকে যে অপরাধীদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখলে তারা অপরাধ করার সুযোগ পাবে না, এবং কারাগারের বাইরের সমাজে অপরাধ হ্রাস পাবে।

তবে, বর্তমান সময়ে সবচেয়ে কার্যকর এবং গ্রহণযোগ্য দর্শন হলো অপরাধ সংশোধন মূলক দর্শন। Reformative Philosophy বা অপরাধ সংশোধন মূলক দর্শনের আলাপের মূল জায়গা হলো প্রত্যেক মানুষই নিজেকে সংশোধন করার অধিকার রাখে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার পর এবং জাতিসংঘ চার্টার প্রকাশিত হবার পর এই দর্শনটির বিকাশ ঘটে। আরনল্ড এস কোফম্যান (১৯৬০) বলেন যে, "সংশোধন মূলক দর্শনের উদ্দেশ্য হলো অপরাধীদের সংশোধন করার মাধ্যমে তাদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা" (পৃ. ৫০)। বর্তমানে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোর জেলে এই নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে, এবং লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এই দেশগুলোতে অপরাধের মাত্রা অন্যান্য দেশের তুলনায় সামান্য।

ফ্রান্সের *কোড দি প্রসিডিউর পিনাল*-ও মনে করে প্রতিটি কারাগারে একটি করে লাইব্রেরি থাকা আবশ্যিক। তারা আরো মনে করে কারাগারে প্রচুর পরিমাণ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড থাকা উচিত। অর্থ্যাৎ কারাগারের উদ্দেশ্যই কেবল পরিবর্তন হয়নি বরং তা পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়েছিলো। ডেভিডের ভাষ্যমতে, কারাগারের উদ্দেশ্য বন্দীদের উৎপাদনশীল ও আইন মেনে চলা মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। উনিশ শতকের সংস্কারকরা কারাগারকে কেবল শাস্তি প্রদানের স্থান থেকে সংশোধনস্থল করতে চেয়েছেন।

কারাগারে পুনর্বাসন ও সংশোধন নিয়ে ডেভিড উইলিয়াম লুইস (২০০৯) বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

> পুনর্বাসনের তত্ত্বগুলো যুক্তি দেখায় যে কারাগারের উদ্দেশ্য হলো বন্দীদের জীবনকে এমনভাবে পরিবর্তন করা যা তাদের মুক্তির পরে সমাজের উৎপাদনশীল এবং আইন মেনে চলা মানুষ করে তুলবে। ধারণাটি উনিশ শতকের সংস্কারকদের দ্বারা উন্নীত হয়েছিল, যারা কারাগারকে অতীতের কঠোর শাস্তির মানবিক বিকল্প হিসেবে প্রচার করেছিল। অনেক সরকার এবং কারাগার ব্যবস্থা সরকারী লক্ষ্য হিসেবে পুনর্বাসন প্রক্রিয়াকে গ্রহণ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায়, জেল সংস্থাগুলোকে প্রায়ই এই কারণে 'সংশোধন' পরিষেবা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। (পৃ. ৬)

কারানাট্য প্রসঙ্গে

কারানাট্য হলো কারাবন্দিদের জন্য এবং/অথবা কারাবন্দিদের দ্বারা কারাগারে পরিবেশিত বা মঞ্চস্থ একধরণের নাট্য। এটি বন্দীদের পুনর্বাসনের একটি ধরন হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে, কারণ এটি তাদের যোগাযোগ এবং দলগত কাজের দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করতে পারে। এটি বন্দী এবং কর্মীদের জন্য বিনোদনের একটি মাধ্যম হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। কারানাট্যকে একটি "আম্রেলা টার্ম" হিসেবে উল্লেখ করে এর পরিধি প্রসঙ্গে চীনা গবেষক জাউই ঝ্যাং (২০১৭) বলেন,

> prison theatre is a term that has been used when referring to theatre-based work within the criminal justice system and has been an umbrella term that includes drama based 'correctional' programs, theatre productions with or by prisoners. (পৃ. ২৯৫)

লোপেজের ভাষ্যমতে ড্রামা থেরাপি হলো ব্যক্তিগত ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করার একটি মাধ্যমও। *In the introduction to Prison Theatre: Perspectives and Practices* বইতে চার্চিল ও

Dhaka University Institutional Repository

দস্তেয়ভস্কির বরাত দিয়ে জেমস থম্পসন (১৯৯৮) কারানাট্যকে পর্যবেক্ষক দ্বারা সমাজকে সমালোচনা ও বিচার করার বাতায়ন হিসেবে উল্লেখ করেন। পল রাইডার রায়ান (১৯৭৬) সংশোধন প্রক্রিয়ারূপে কারানাট্যের যাত্রাকাল হিসেবে ১৯৭৩ সালকে উদ্ধৃত করেন।

অপরাধ প্রশমন এবং অপরাধীর মনোভাবের ইতিবাচক পরিবর্তনে কারানাট্যের ভূমিকা প্রসঙ্গে গবেষক মাইকেল বালফোর (২০০৪) বলেন, "কারাবন্দিদের পুনঃশিক্ষণ, পুনঃসামাজিকীকরণ এবং পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কারানাট্য একটি কার্যকরী উপাদান বা প্রক্রিয়া হিসেবে ক্রিয়া করতে সক্ষম" (পৃ. ২)। এছাড়াও, কারানাট্যের ভূমিকা প্রসঙ্গে শেইলর জেনাথন (২০১০) বলেন, "জেল থিয়েটারে, অনুশীলনকারীরা শিক্ষা বা পুনর্বাসনের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রায়ই নাটকের কাজ অন্বেষণে সংশোধনমূলক সুবিধা জেল, কারাগার এবং আটক কেন্দ্রগুলোতে অপরাধীদের নিযুক্ত করে" (পৃ. ২৭)।

থিয়েটার ইন প্রিজন এ টেক্সট নির্মাণের ক্ষেত্রে জ্ঞানের নানান মাধ্যমকে যুক্ত করা হয়। অপরাধবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, আইনশাস্ত্রের মত জ্ঞানের নানান শাখার সম্মিলনে থিয়েটার ইন প্রিজনের চর্চা করা হয়। অর্থ্যাৎ যথাযথ অনুসন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞানের নানান শাখার সংযোগে কারানাট্য রচিত হয়। সঙ্গত কারণেই Rehabilitation through Arts কে লরেন মুলার (২০০৩) হাইব্রিড বলে উল্লেখ করেন। কারানাট্যের সম্ভাবনা নিয়ে কারানাট্য প্রথমদিকে মঞ্চস্থ হবার বিপক্ষে থাকা এক আইনজীবীর উদ্ধৃতি উল্লেখ করে তিনি বলেন, "আপনি দেখুন, আমি একটি নতুন ধরনের স্বাধীনতা খুঁজে পেয়েছি. এই ধরনের স্বাধীনতা যা আমাকে আমার জীবনে গর্ভবতী সময়কে সম্ভাবনা এবং যৌবনের সীমাহীন কল্পনার সাথে পুনরুজ্জীবিত করার অনুমতি দিয়েছে" (পৃ. ৬৬)।

Dhaka University Institutional Repository

বালফোর (২০০৪) তার *Theatre in Prison: Theory And Practice* গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেন যে, "There is considerable evidence of prison theatre and art work during the second world war, of performances in concentration camps (Balfore, 2001; Berghaus and Wolf, 1989; Berghaus, 1996; Jelavich, 1993; Solzhenistsyn, 1975)" (পৃ. ২)।

নিউসাউথ ওয়েলসে ব্রিটিশ কলোনী স্থাপনের দায়ে অভিযুক্ত কারাবন্দীরা ১৭৮৯ সালে কারাগারে নাটক নির্মাণ ও পরিবেশন করে। এই নাটকে কারাগারের বন্দীদের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে মনোভাব উঠে আসে এবং কারাগারে থেকেও তাদের মনস্তত্ত্বে কি কি কাজ করে সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ম্যাকমিশ (২০০৪) এ আরো একটি কারানাট্যের প্রসঙ্গ উঠে আসে। সেমুয়েল বেকেটের ওয়েটিং ফর গডো 'সান কুয়েনটিন' কারাগারের বন্দীরা পরিবেশন করে ১৯৫৭ সালে। ১৪০০ কারাবন্দীর সামনে এই নাটকটি পরিবেশিত হয় কারাগারের ডাইনিং হলে। যেসকল বন্দী তাদের নির্দিষ্ট সেল থেকে বের হতে পারেননি তারা লাউড স্পীকারের মাধ্যমে নাটকটি শুনেছে। এডোয়ার্ড হেলমোর (২০১৬) ঐ কারাগারের এক বন্দী রিকি ক্লউচি যিনি নাটকটি কেবল শুনেছেন তার কথা তুলে ধরেছেন, "The thing that everyone in San Quentin understood about Beckett, while the rest of the world had trouble catching up, was what it meant to be in the face of it" (পৃ. ৪৭)। হেলমোর উল্লেখ করেন যে, এই নাটক দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে পরবর্তীতে ওই কারাগারের বন্দীরাই ১৯৬১ পুনরায় ওই নাটক পরিবেশন করেন এবং এক্ষেত্রে ড্রামাট্রার্জি করেন রিকি ক্লউচি নিজেই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৫০ এর দশকে সান কুয়েন্টিন স্টেট জেলে 'সান কুয়েন্টিন ড্রামা ওয়ার্কশপ' দেশটির প্রথম কারা নাটকের উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল (ম্যাকঅ্যাভিনচে, ২০১১)। গবেষক টকি

Dhaka University Institutional Repository

(২০০৭) এর মতে, ১৯৬০ ও ৭০-এর দশকে বিশ্বব্যাপী কারানাট্যের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উদাহরণ তৈরি হতে শুরু করে।

ম্যাকঅ্যাভিনচে (২০১১) উল্লেখ করেন যে, প্রিজন থিয়েটার ১৭৮৯ সাল পর্যন্ত চলে। এই সময়ে, নিউ সাউথ ওয়েলসের উপনিবেশে বন্দী নাট্যকার জর্জ ফারকুহারের *দ্য রিক্রুটিং অফিসার* মঞ্চায়ন করা হয়েছিল। তাছাড়া, 'রিহাবিলিটেশন থ্রু আর্টস (আরটিএ)' হলো বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রিজন থিয়েটার প্রোগ্রামগুলোর একটি।

বাংলাদেশের কারানাট্য প্রসঙ্গে

বাংলাদেশে কারাগারে নাটকের কেবল একটি নাটক পরিবেশনের কথা জানা যায় আর তা হল ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত নাটক 'কবর'। এই নাটক রচিত হয়েছে জেলখানার ভেতরেই এবং প্রথম প্রদর্শনীও হয়েছে জেলখানায় কয়েদীদের দিয়ে। রণেশ দাশগুপ্ত, মুনীর চৌধুরীসহ আরো রাজবন্দীদের উদ্যোগে এই নাটক মঞ্চস্থ হয়। জেলখানার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কেবল মোমবাতির আলোতে কয়েদীদের দিয়েই এই নাটক পরিবেশিত হয়।

বাংলাদেশের কারাগারে নাট্যচর্চা অন্যকোন লিখিত দলিল পাওয়া যায়নি। তাছাড়া, বাংলাদেশ জেল কোড ৬৪৯ এর ১ ধারা অনুযায়ী একজন কয়েদী কি গান গাইতে পারবে তাও ঐ জেলের কতৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে এবং জাতীয় দিবসগুলোতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়া অন্য কোন সময় সাংস্কৃতিক চর্চার কোন ধরনের সুযোগ জেলে নেই।

গবেষণা সমস্যা

উপরোল্লিখিত সাহিত্য পর্যালোচনা অংশে কারাগার ব্যবস্থার উন্মেষ, শাস্তি ও কারাগারের দর্শন, আধুনিক কারাগারের সংশোধনধর্মী নীতি, কারানাট্যের ধারণা-ইতিহাস-সম্ভবনা এবং বাংলাদেশের কারাগার

Dhaka University Institutional Repository

সমূহে নাট্যচর্চার অপ্রতুলতার বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের কারাগার সমূহের অপরাধীদের সংশোধণের লক্ষ্যে কারানাট্যের আঙ্গিক ও এর নন্দনতত্ত্ব অনুসন্ধান বর্তমান গবেষণার সমস্যা রূপে চিত্রিত করা হয়েছে।

গবেষণা প্রশ্ন

উক্ত গবেষণা সমস্যা থেকে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে যে, বাংলাদেশে কারানাট্যের নন্দনতত্ত্ব কিরূপ হবে?

সহায়ক প্রশ্ন:

বাংলাদেশের কারানাট্যের আঙ্গিক কেমন হবে?

গবেষণা পরিধি

বর্তমান গবেষণাটি ২০২০ জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়েছে। সমগ্র বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ও জেলা কারাগার বর্তমান গবেষণার পরিধির অন্তর্ভূক্ত।

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য সমাজবিজ্ঞানের গবেষণা পদ্ধতি বা sociological research method (ওয়ালিম্যান, ২০০৬; ব্রাইম্যান ও বেল, ২০১৯) এবং নৃতাত্ত্বিক গবেষণা পদ্ধতি বা ethnographic research method (লেকম্পতে ও শেনসুল, ২০১০)-এ প্রয়োগকৃত কৌশলগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক উপাত্তের ক্ষেত্রে গুণবাচক (qualitative data) ও সংখ্যাবাচক (quantitative data) উভয় প্রকার উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণার প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহের জন্য একাধিক কৌশলের প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রথমত, কয়েদীদের প্রাক-কারাজীবন, কারাজীবন ও কারা-পরবর্তী জীবনের অভিজ্ঞতার উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এই লক্ষ্যে সুবিধাজনক নমুনায়ন কৌশল বা convenient sampling technique ও স্নো-বলিং কৌশল বা snow-balling technique অনুসরণ করে স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে সমকালীন সময় পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও জেলা কারাগারে বন্দী আছেন বা ছিলেন এরকম ২০ জন ব্যক্তির ইনডেপ্থ সাক্ষাৎকার (in-depth interview) গ্রহণ করা হয়েছে। উপাত্তের মান যাচাইয়ের লক্ষ্যে এবং আরো বিশদ উপাত্ত সংগ্রহের লক্ষ্যে বাংলাদেশের ৫টি জেলা ও বিভাগীয় শহরের একই কারাগার বা ভিন্ন ভিন্ন কারাগারে অন্তরীণ ছিলেন এমন নূন্যতম পাঁচজন সাবেক কারাবন্দীদের সমন্বয়ে পাঁচটি পৃথক ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন (focused group discussion) আয়োজন করা হয়েছে। এখানে মোট ৩৪জন সাবেক কারাবন্দী অংশগ্রহণ করেছেন। একইসাথে, কারা অন্তরীণ হওয়া ব্যক্তির সামাজিক জীবনে কি কি প্রভাব ফেলে তা অন্বেষণের লক্ষ্যে তার পরিবার, স্বজন ও স্থানীয়দের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের কারাগারের প্রামাণ্য চিত্র এবং কারাগারের সাংস্কৃতিকচর্চার বর্তমান চিত্র অন্বেষণ ও বিশ্লেষণের লক্ষ্যে দেশের ২টি কেন্দ্রীয় ও ১০টি জেলা কারাগার সরেজমিনে পরিদর্শন (field observation), কারা কর্মকর্তা, জেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, জেলা কালচারাল কর্মকর্তার সাক্ষাৎকারগ্রহণ (open-ended interview) করা হয়েছে। সরেজমিন পরিদর্শনের ক্ষেত্রে কারাগারের জনবল, আবাসন, খাদ্য, চিকিৎসা, সেনিটেশন, নিরাপত্তা ও বিনোদন বিষয়ের সংখ্যাগত (quantitative) ও গুণগত (qualitative) উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তাত্ত্বিক কাঠামো

বর্তমান গবেষণায় তাত্ত্বিক কাঠামো হিসেবে পাওলো ফ্রেইরে (২০০৫) ও অগাস্তো বোয়াল (২০০৮) এর তত্ত্ব অনুসরণ করা হয়েছে। পারস্পরিক বোঝাপড়া ও জ্ঞান উৎপাদনের জন্য সংলাপ আবশ্যক দাবী করে ব্রাজিলিয়ান তাত্ত্বিক পাওলো ফ্রেইরে (২০০৫) বলেন, এডুকেটরের এমন 'ভাষা' প্রয়োগ করা উচিত যা শিক্ষা গ্রহণকারীর অবস্থাকে প্রতিরূপায়ণে সমর্থ হবে। তিনি বর্তমানের পাশাপাশি অতীত সম্পর্কেও সচেতন, অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির প্রতি জোর দিয়েছেন (পৃ. ৮৭-১২৪)। অর্থাৎ, জ্ঞান উৎপাদনের জন্য কার্যকর ভাষা বা যোগাযোগ মাধ্যম নির্বাচন, অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গি ও সংলাপ সংগঠন জরুরী।

ব্রাজিলিয়ান নাট্যনির্দেশক অগাস্তো বোয়াল (২০০৮) বলেন, থিয়েটারকে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যকার যোগাযোগের ভাষায় পরিণত করা গেলেই কেবল, জীবনে ঘটতে থাকা সংকটগুলোকে চিহ্নিত করা যায়। থিয়েটারকে ভাষা হিসেবে গ্রহণ করে সংলাপ সংগঠন করা গেলেই চিহ্নিত এই সংকট থেকে উত্তরণ বা মুক্তির পথ তৈরী করা সম্ভব। তাই বোয়াল বলেন, "নিপীড়িতের নন্দনতত্ত্ব আবশ্যিকভাবেই মুক্তির নন্দনতত্ত্ব" (পৃ. ১৩৫)।

সংলাপ আশ্রিত এই নাট্যভাষা তৈরির লক্ষ্যে বোয়াল কিছু কৌশল প্রস্তাব করেছেন। মানবশরীরকে থিয়েটারের প্রধানতম উপাদান উল্লেখ করে ব্রাজিলিয়ান নাট্যনির্দেশক অগাস্তো বোয়াল (২০০৮) বলেন,

> মানবদেহই শব্দ ও দৃশ্যকল্প নির্মাণের মূল উৎস। নাট্যভাষা নির্মাণের উৎকর্ষতার জন্য একজন পরিবেশকের সর্বাগ্রে প্রয়োজন, তার সক্ষমতার চূড়ান্ত স্তরে উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে তার নিজের শরীরকে জানা এবং শরীরকে নিজের আয়ত্বে আনার কৌশল রপ্ত করা। এই প্রক্রিয়া নিজের শরীরকে আয়ত্ব আনার মধ্য দিয়ে একজন মানুষ তার নৈর্বিত্তিকস্বত্বাকে কর্তাস্বত্বায় রূপান্তরে সমর্থ হবেন। যার

Dhaka University Institutional Repository

ফলে, একজন নিষ্ক্রিয় মানুষ নাট্যচর্চার মধ্য দিয়ে 'সক্রিয়' অভিনেতায় রূপান্তরিত হবেন, নাট্যে এবং বাস্তবজীবনে। (পৃ. ১০২)

বোয়াল তার বইতে উল্লেখ করেছেন একজন দর্শক কি কি ধাপ অনুসরণ করে অভিনেতায় পরিণত হন। ধাপগুলো হলো:

১। প্রথম ধাপ: শরীরকে জানা (Knowing the body)

২। দ্বিতীয় ধাপ: শরীরকে প্রকাশযোগ্য করে তোলার অনুশীলন (Making the body expressive)

৩। তৃতীয় ধাপ: নাট্যভাষা নির্মাণ (The theatre as Language)

৪। চতুর্থ ধাপ: নাট্যবয়ান নির্মাণ (The theatre as discourse) (পৃ. ১০২)।

অগাস্টো বোয়াল দর্শককে অভিনেতায় পরিণত করার প্রথম ধাপ তথা শরীরকে জানা প্রসঙ্গে বলেন, প্রান্তিক সম্প্রদায়ের সাথে থিয়েটার কাজের প্রাথমিক পর্যায় হবে এই ধাপ। এই পর্যায়টি শারীরিকতাকে বোঝা এবং রূপান্তরিত করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। বোয়াল যুক্তি দেন যে মানুষের শরীর তাদের সামাজিক ভূমিকা এবং কাজ দ্বারা গঠিত হয়। নির্দিষ্ট জীবিকা অনুসরণের ফলে মানবশরীরে যেই অসতর্ক সীমাবদ্ধতা তৈরি হয় তা থেকে মুক্ত হতে, অংশগ্রহণকারীরা এই ধাপে বিভিন্ন অনুশীলনে জড়িত হবেন। এই অনুশীলনগুলির উদ্দেশ্য হলো:

- পেশী গঠনকে প্রশ্নবিদ্ধ করা বা অভ্যাসগত শারীরিক প্যাটার্ন ভাঙা।
- শারীরিক চেতনা বাড়ানো বা শরীরের সম্ভাবনা এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া।
- বিভিন্ন চরিত্রের ভূমিকা রাখা বা বিভিন্ন ভূমিকাকে শারীরিকভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা বিকাশ করা।

এ ধরনের অনুশীলনের উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে: ধীর গতির দৌড়, পা বাঁকিয়ে দৌড়, দৈত্য দৌড়, চাকা দৌড়, হিপনোসিস অনুশীলন, বক্সিং ম্যাচ এবং নীরব ওয়েস্টার্ন দৃশ্য (পৃ. ১০৩-১০৬)।

বোয়াল বর্ণিত দ্বিতীয় ধাপ 'শরীরকে প্রকাশযোগ্য করে তোলার অনুশীলন'-এর লক্ষ্য হল মৌখিক যোগাযোগের বাইরে গিয়ে শরীরকে ব্যবহার করে আবেগ, ধারণা এবং চরিত্র প্রকাশ করার সক্ষমতা অর্জন। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য বোয়াল একটি সিরিজ গেমের অংশগ্রহণকারীদের যুক্ত হতে উৎসাহ প্রদান করেন। এই গেমের মধ্য দিয়ে অংশগ্রহণকারী মূলত-

- কোন ঘটনা মৌখিকভাবে প্রকাশ করা প্রবণতা থেকে মুক্ত হবেন। অর্থাৎ, যোগাযোগের জন্য শারীরিকতার উপর নির্ভরশীল হবেন।
- শারীরিক সচেতনতা বিকাশিত হবে। প্রকাশের হাতিয়ার হিসাবে তাদের শরীরকে বোঝা এবং নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হবেন।
- বিভিন্ন চরিত্রকে মূর্ত করার সক্ষমতা অর্জন করবেন। অর্থাৎ, বিভিন্ন ভূমিকা এবং দৃষ্টিকোণকে শারীরিকভাবে অনুভব করতে সক্ষম হয়ে উঠবেন।

এই অনুশীলনী গেমগুলো অংশগ্রহণকারীদের সৃজনশীলভাবে চিন্তা করতে, স্ব-সচেতনতাকে অতিক্রম করতে এবং বিভিন্ন শারীরিক প্রকাশ অন্বেষণ করতে সাহায্য করে। এই গেমগুলিতে অংশগ্রহণ করে, অংশগ্রহণকারীরা কেবল তাদের শারীরিক দক্ষতা বিকাশ করে না, বরং নিজেদের এবং অন্যদের দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে, সামাজিক রীতিনীতি এবং ক্ষমতা-সম্পর্ককে চ্যালেঞ্জ করার সামর্থ অর্জন করেন (পৃ. ১০৬-১০৮)।

বোয়ালের তৃতীয় ধাপের বাংলা পরিভাষা হতে পারে ‘নাট্যভাষা নির্মাণ’ তথা একটি ভাষা বা যোগাযোগের মাধ্যমরূপে থিয়েটারের প্রয়োগ। এই ধাপে তিনটি পর্যায়ে দর্শক-অভিনেতার জড়িত হয়ে থাকেন-

- স্বতঃস্ফূর্ত ও যূথবদ্ধ নাট্যকর্ম নির্মাণ প্রক্রিয়া: এই প্রক্রিয়ায় দর্শকের নিকট একটি সমস্যা হাজির করা হয় এবং তাদের কাছ থেকে এর সমাধান প্রত্যাশা করেন। দর্শকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাধান প্রস্তাব করেন এবং অভিনেতারা তৎক্ষণাৎ মঞ্চে প্রস্তাবিত সমাধানগুলি অভিনয় করেন। এটি উভয়পক্ষকে যৌথ সৃজনশীলতা এবং সমস্যা সমাধানের সুযোগ করে দেয়।
- ছবি থিয়েটার: দর্শকরা নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে তাদের মতামত এবং ধারণা প্রকাশ করার জন্য অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের শরীর ব্যবহার করে শারীরিক চিত্র তৈরি করে। এই ভিজ্যুয়াল ভাষা মৌখিক যোগাযোগকে এড়িয়ে যায় এবং গভীরভাবে বোঝার জন্য উৎসাহিত করে।
- ফোরাম থিয়েটার: এই প্রক্রিয়ায় দর্শকরা একটি পারফর্ম্যান্সকে নিজস্ব চিন্তা দ্বারা নতুন নতুন দিকে মোড় দিতে পারে এবং একটি চরিত্রের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, বিকল্প কর্মকাণ্ড এবং সমাধানের পরামর্শ দিতে পারে। এটি দর্শকদের কাহিনীকে সক্রিয়ভাবে আকার দিতে এবং সামাজিক প্রথাগুলিকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা প্রদান করে।

এই কৌশলগুলির মাধ্যমে, বোয়াল অভিনেতা এবং দর্শকের মধ্যকার বাধা ভেঙে দিতে চান, দর্শকদের অর্থ বা ব্যাখ্যা বা বয়ান সৃষ্টিতে সক্রিয় অংশগ্রহণকারীতে রূপান্তরিত করেন। এই নাট্য অনুশীলনে জড়িত হয়ে, ব্যক্তিরা সমালোচনামূলক চিন্তা, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা এবং কর্তাস্বত্তা হওয়ার অনুভূতি অর্জন করেন (পৃ. ১০৯-১২০)।

বোয়ালের বর্ণিত চতুর্থ ধাপের বাংলা পরিভাষা হতে পারে, 'নাট্যবয়ান নির্মাণ'। দর্শকদের সমালোচনামূলক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করা এবং সামাজিক পরিবর্তনে জড়িত করার একটি কৌশল হয়ে উঠতে পারে এই ধাপ। এটি ক্ষমতা কাঠামোকে প্রশ্নবিদ্ধ করার এবং সামাজিক রীতিনীতি চ্যালেঞ্জ করার একটি হাতিয়ার হিসাবে থিয়েটারের ভূমিকাকে গুরুত্ব দেয়। নাট্যবয়ান নির্মাণের মূল কৌশলগুলির মধ্যে রয়েছে:

- সংবাদপত্র থিয়েটার
- অদৃশ্য থিয়েটার
- ফটো-রোম্যান্স থিয়েটার
- দমনের সংস্কৃতি ভাঙার থিয়েটার
- পৌরাণিক কাহিনী নির্ভর থিয়েটার
- বিশ্লেষণমূলক থিয়েটার
- রীতিনীতি এবং মুখোশ থিয়েটার

এই কৌশলগুলি ব্যবহার করে, বোয়াল দর্শকদের নাট্য প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হতে উৎসাহিত করেন, প্রভাবশালী বর্ণনাকে চ্যালেঞ্জ করেন। এবং অংশগ্রহণকারীদের আরও ন্যায়সঙ্গত এবং সমতামূলক সমাজ গড়ার ক্ষমতা প্রদান করেন (পৃ. ১২০-১৩৪)।

গবেষণার নৈতিকতা

বর্তমান গবেষণার প্রথম অধ্যায়ে উপস্থাপিত নিবিড় সাক্ষাৎকার ও ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশনে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের নিরাপত্তা, মর্যাদায় যেন কোনরূপ আঘাত না আসে সেই লক্ষ্যে তাদের পরিচিতি গোপন রাখা হয়েছে। বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত ও উপস্থাপিত তথ্য ও তথ্যের বিশ্লেষণ যেন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে হেয়

প্রতিপন্ন না করে, এবং পরবর্তীতে যেন কোনরূপ হুমকি বা ব্ল্যাকমেইলের শিকার না হন সেদিকে সর্তক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। উপাত্ত সংগ্রহ, বাছাই ও বিশ্লেষণে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করা হয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত কোন উপাত্ত অনৈতিক উদ্দেশ্যে পাচার, কারাগার ও কারাকর্তৃপক্ষের নিরাপত্তা গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন করা বা গবেষকের ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে গবেষণাটি করা হয়নি।

প্রথম অধ্যায়: বাংলাদেশের কারাগার ব্যবস্থার বর্তমান চিত্র

বর্তমান অধ্যায়ে বাংলাদেশের কারাগার সমূহের কারা ব্যবস্থাপনার একটি প্রামাণ্য চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। এই লক্ষ্যে সুবিধাজনক নমুনায়ন পদ্ধতিতে দেশের দুইটি কেন্দ্রীয় কারাগার ও দশটি জেলা কারাগারসহ মোট ১২টি কারাগারে মাঠ সমীক্ষার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কারাগারকে অপরাধীদের সংশোধনগার হিসেবে রূপান্তরের মানদন্ড যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে কারাগারের আবাসন, খাদ্য, বন্দি ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা, শারিরীক চিকিৎসা, মানসিক স্বাস্থ্য ও বিনোদন সংক্রান্ত প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। উক্ত প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহের লক্ষ্যে কারাবন্দিদের একান্ত বা নিবিড় সাক্ষাৎকার, কারাবন্দিদের ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন, জেল কর্তৃপক্ষের সাক্ষাৎকার, কারাগার পরিদর্শন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত উপাত্ত সমূহ বর্তমান অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হলো।

১.১ বাংলাদেশের কারাগার সমূহের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের চিত্র

রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগার

রংপুর কারাগার স্থাপিত হয় ১৮৬৪ সালে। ১৯৯৭ সালে কেন্দ্রীয় কারাগারে উন্নীত হয়। ৬.৪৪ একর জমির ওপর এর অবস্থান। কারা অভ্যন্তরে তিস্তা, ঘাঘট, করতোয়া নামে রয়েছে তিনটি ভবন। হাজতি ভবন-করতোয়া- ৩ (তিন) তলা বিশিষ্ট, ৬ টি ওয়ার্ড, ২টি কিশোর ওয়ার্ডসহ) কয়েদি ভবন-১টি ৪ (চার) তলা বিশিষ্ট ও ১টি ৩ (তিন) তলা বিশিষ্ট মোট = ২টি। কেন্দ্রীয় কারাগারে আসামি ধারণক্ষমতা ১২৭৯ জন। এর মধ্যে পুরুষ ১২১৫ ও নারী ৬৪ জন। বর্তমানে বন্দী রয়েছে ১৫৬২ জন।

কারা অভ্যন্তরে কারাবন্দীদের মানুষিক বিকাশ ও চিত্ত বিনোদনের জন্য সংস্কৃতিক প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয় রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে কারাবন্দীদের মধ্যে ১৫-২০ সদস্যের একটি সঙ্গতি দল রয়েছেন

কারাগারের অভ্যন্তরে ভিন্ন ভিন্ন ওয়ার্ডে তারা পারফরম করে থাকে। অন্য দিকে নারী ওয়ার্ডে আলাদাভাবে সংস্কৃতিক চর্চা করে থাকে। রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে গান, নাচ, আবৃত্তি, অভিনয় যেমন খুশি তেমন সাজ, আঞ্চলিক ভাষায় সঙ্গীত পরিবেশনা ইত্যাদি শৈল্পিক ক্রিয়া হয়ে থাকে। তাদের সংস্কৃতিক কাণ্ড সুন্দর ভাবে করার জন্য নারী ও পুরুষ ওয়ার্ডে ঢোল, তবলা, খনজনি, একতার, দোতারা, হারমোনিয়াম, জিপসি ইত্যাদি নানা ধরণের যন্ত আছে, তুলবা মুলক পুরুষ ওয়ার্ডে বাদ্য যন্ত্রপাতির সংখ্যা বেশি থাকে। মহিলা ওয়ার্ডে তুলনামূলক কম থাকে। উদ্ধতন কর্মকর্তারা যখন কারা পরিদর্শন করেন অনেক কারাবন্দী পারফর্ম করে থাকে। ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, পহেলা বৈশাখ, ২৬ মার্চ ও ১৬ ডিসেম্বর এবং অন্যান্য দিবসে কারা অভ্যন্তে নিরা নিরাপত্তা বজায় রেখে কালচারা প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়। জেল কতৃপক্ষের অনুরোধে কারা বন্দীদের বাহিরের শিল্পীদের এনে পারফরম্যান্স করা হয় (বিশেষ করে গান ও নাচ) এসকল বিশেষ দিবসে, এসব সংস্কৃতি অনুষ্ঠানের পাশাপাশি উন্নত খাবার পরিবেশ করা হয়। তাছাড়া নারী ও পুরুষ করাবন্দীর চিও বিনোদনের জন্য প্রতিটি ওয়ার্ডে টেলিভিশনের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে একমাত্র টেলিভিশন চ্যানেল হলো বিটিভি ও রেডিও উপভোগ করার সুযেগ রয়েছে। কতৃপক্ষ নির্ধারিত খবরেরকাগজের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া রয়েছে কারা লাইব্রেরি প্রায় সেখানে ৫০০০ বই রয়েছে। মুজিব বর্ষে উদযানের জন্য কারা লাইব্রেরিতে মুজিব কর্ণার তৈরি হয়েছে। তবে, নারী ওর্য়াডে সঙ্গিত অনুষ্ঠানে বাহিরের শিল্পী আসতে পার না, কারাণ জেল কতৃপক্ষের অনুমোদন নেই। বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (APA) এর আওতায় নির্ধারিত সময়েরর বিপরীতে কালচারাল প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। কারা তত্বাবধায়ক প্রশান্ত কুমার বণিক তথ্য দিয়েছেন যে ২০২১ সালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বড় আকার এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এটিএন বাংলা সেই অনুষ্ঠানটি

সরাসরি সম্প্রচার করেছিল। এবং সেই অনুষ্ঠানটির উপস্থাপনা করেছিলেন এটিএন বাংলার সুপরিচিত উপস্থাপক মুন্নী সাহা। সেই অনুষ্ঠানের বিচারক ছিলেন বাংলাদেশের বিখ্যাত কণ্ঠ শিল্পী জনাব খুরশিদ আলম।

বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগার

১৮২৯ সালে জেলা কারাগার হিসেবে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ৩ মার্চ ১৯৯৭ সালে এটিকে জেলা কারাগার হতে কেন্দ্রীয় কারাগারে রূপান্তর করা হয়। কারাগারটির মোট জমির পরিমাণ ২১.২০০৭ একর। কারাগারের অভ্যন্তরে জমির পরিমাণ ৯.৬০০ একর, কারা বহিঃস্থ জমির পরিমাণ ৭.৬৮২৬ একর (বাসা বাড়ি, মাঠ ও পুকুর) এবং কাশিপুরস্থ বাগানবাড়িতে জমির পরিমাণ ৩.৯১৮১ একর। কারাগারে বন্দীর ধারণক্ষমতা ৬৩৩ জন (পুরুষ ৬০৩ জন এবং মহিলা ৩০ জন)। কারা হাসপাতালের ধারণক্ষমতা ৫৮ জন। সুষ্ঠ কারা প্রশাসন পরিচালনার জন্য ৩২ ক্যাটাগরির ৩৩৮ জন জনবল বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগারে নিরাপত্তার স্বার্থে কর্মরত রয়েছে।

বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামের জন্য সরকারি বাজেট নাই বললেই চলে। তবে বিভিন্ন জাতীয় প্রোগ্রামে সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম হয়ে থাকে। কারা কর্তৃপক্ষ এই তথ্য প্রদান করেন যে, বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে কারাবন্দীরা অবশ্যই অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা গান করেন, কৌতুক করেন। এখানে বেশ ভালো ভালো শিল্পী রয়েছে। যেকোনো অনুষ্ঠান হলে কারাবন্দীদের অনুষ্ঠানের আগে জানানো হয়। আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক কারাবন্দীদের কাছ থেকে নামের লিস্ট নেয়া হয়। অংশগ্রহণকারীগন কখনও একক গান করেন আবার কখনও সম্মিলিত গান পরিবেশনা করে থাকেন। কারাবন্দীদের মনোদৈহিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য এখানে যে ধরনের সাংস্কৃতিক চর্চা দরকার ছিল সেটা অনুপস্থিত। বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার রত্না রায়কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, "আপনারা কিভাবে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড গুলো চালান?"। প্রশ্নের জবাবে এককথায় তিনি বলেন, "এখানে সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামের জন্য

কোন সরকারের আলাদা করে বাজেট নেই। তবে নিজস্ব অর্থায়ন রয়েছে সেই অর্থ দিয়ে আমরা সাংস্কৃতিক কার্যক্রম চালিয়ে থাকি"। জনাব রত্না রায়ের কথা প্রতীয়মান যে সাংস্কৃতিক চর্চার তেমন কোনো বিকাশ নেই। সরকার কারাগার কে বলেছেন সংশোধনাগার সে ক্ষেত্রে একজন কারাবন্দীর নিজেকে সংশোধন করার জন্য সংস্কৃতি চর্চার কোন বিকল্প নেই। এই জন্য সংস্কৃতিক চর্চার জন্য সরকারের আলাদা বাজেট থাকতে হবে। কারা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে বা কারাগারের অর্থায়নে এ ধরনের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম করা মুশকিল। কারাগারের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার ব্যবস্থা করতে হবে। তবেই একজন কারাবন্দী কারাগার থেকে বের হয়ে তার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারবেন অন্যথায় সংশোধনাগার বলার কোনো যৌক্তিকতা থাকবে না।

কারাগারে সাংস্কৃতিক চর্চা বিকাশে জেলা কালচারাল অফিসারের ভূমিকা ও অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে জেলা কালচারাল অফিসার অবগত করেন যে, বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগারের কর্মকর্তাদের সাথে নিজেদের বেশ ভালো জানাশোনা রয়েছে। বিভিন্ন জাতীয় প্রোগ্রামগুলোতে বরিশাল কেন্দ্রীয় কারা কর্তৃপক্ষ জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাথে যোগাযোগ করে এবং সেই অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়ে থাকে। বিস্তারিত জানাতে গিয়ে কালচারাল অফিসার বলেন, "সমাজসেবা অধিদপ্তরের উদ্যোগে এখানে গানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছিল করোনার আগে। সে ক্ষেত্রে আমরা শিল্পকলা একাডেমি থেকে বেশ প্রশিক্ষিত প্রশিক্ষকবৃন্দ দিয়ে এখানে কারাবন্দীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু করোনা মহামারীর কারণে সেই প্রজেক্ট বন্ধ হয়ে যায়। আমরা জেলা প্রশাসক মহোদয় জেল-সুপার এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেছি অতি দ্রুত আমরা এখানে নাচ, গান, অভিনয় আবৃত্তি ইত্যাদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা শুরু করবো। বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে কোরআন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অনেক আগে থেকেই প্রচলিত রয়েছে। এখানে আমরা প্রোগ্রাম করতে আসলে কারাবন্দীদের সুযোগ দিয়ে থাকি। অর্থাৎ যারা ভালো গান করতে

পারেন কবিতা আবৃত্তি করতে পারেন তারা বিভিন্ন জাতীয় দিবসে এখানে পরিবেশনা করে থাকেন। বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগারের সাংস্কৃতিক চর্চার জন্য আমরা সবসময় তৎপর ছিলাম এবং বর্তমানেও তৎপর রয়েছে যদিও করোনা মহামারীর কারণে কিছুটা বিলম্বিত হচ্ছে তারপরও আমরা আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করছি"।

বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সমৃদ্ধির জন্য বেসরকারি সংস্থার অবদান সম্পর্কে বলতে গিয়ে জেল সুপার বলেন, "বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সমৃদ্ধির জন্য বেসরকারি সংস্থার অবদান বা অনুদানের কোন সুযোগ নেই। কারণ কারাগার একটি গোপনীয় জায়গা এবং কারা অভ্যন্তরে সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষেধ। যা কিছু করা হয় সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করে করা হয়"।

সুতরাং, জাতীয় দিবসগুলোতে যে অনুষ্ঠানগুলো সে গুলো ব্যতীত বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সমৃদ্ধির ও কারাবাসীদের মনোঃদৈহিক উৎকর্ষতার লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য মাত্রার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

পটুয়াখালী জেলা কারাগার

পটুয়াখালী জেলা কারাগার প্রতিষ্ঠিত হয় ২৯ শে এপ্রিল ১৯৮০ সালে। কারাগারটির মোট জমির পরিমাণ ১৫.২৫ একর। । সুষ্ঠ কারা প্রশাসন পরিচালনার জন্য মেট ১৫১ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী পটুয়াখালী জেলা কারাগারে নিরাপত্তার স্বার্থে কর্মরত রয়েছে। পটুয়াখালী জেলা কারাগারে বন্দীর ধারণক্ষমতা ৩২৪ জন। কিন্তু বর্তমানে এখানে কারাবন্দীর সংখ্যা মোট ৫৩০জন।

পটুয়াখালী জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড প্রতি বছরই প্রোগ্রাম হয়। তবে করোনার পরে তেমন কোন কালচারাল প্রোগ্রাম হয়নি। করোনার আগে নিয়মিত সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম হতো। তবে জাতীয় প্রোগ্রামগুলো নিয়মিত হয়। যেমন, বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, ২১শে ফেব্রুয়ারি, পহেলা বৈশাখ ইত্যাদি।

একজন ডেপুটি জেলার বলেন, "যে রকমের সরকারি বরাদ্দ তেমন প্রোগ্রাম। আমরা কর্মকর্তারা তো বাড়ি থেকে টাকা এনে প্রোগ্রাম করবো না। তবে মাঝে মাঝে জেলা প্রশাসন থেকে অনুমতি আসে বিভিন্ন প্রোগ্রাম করার জন্য। সেক্ষেত্রে সকল ব্যয়ভার জেলা প্রশাসন বহন করেন"। সর্বশেষ হয়েছিলো শেখ রাসেল দিবস-২০২২। শেখ রাসেল দিবসে সকল কারাবন্দীদের দুপুর বেলা জেলা প্রশাসন এক প্রীতি ভোজের আয়োজন করেছিল।

জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে কারাবন্দীরা কি অংশগ্রহণ করেন কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে ডেপুটি জেলার আরক বলেন, "অব্যশই কারাবন্দীরা সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। আমরা শুধু ওদেরকে বলি যে একটা প্রোগ্রাম আছে তোমরা কে কে অংশগ্রহণ করতে চাও। ওরা নিজেরাই আসে কে কি করতে চায় সেই বিষয়ে নামের লিস্ট দিয়ে যায়। কারাগারে অনেক কারাবন্দী আছে যারা চমৎকার গান করেন। আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন। তাঁরা গান করে, কৌতুক করে, অভিনয় করে। অনেকে আবার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় নির্ধারিত হয়। মাঝে মাঝে প্রোগ্রামে আমরা পুরষ্কার দেই। আবার মাঝে মাঝে জেলা প্রশাসন থেকেও পুরষ্কারের ব্যবস্থা করা করা হয়। যারা পুরষ্কার পায় তাঁরা আরও আগ্রহী হয় পরবর্তী প্রোগ্রামের জন্য"।

এই জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে শিল্পকলা একাডেমির কার্যক্রম হয় কিনা জানতে চাইলে ডেপুটি জেলার বলেন, পটুয়াখালী জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে শিল্পকলা একাডেমির কার্যক্রম অবশ্যই হয়। পটুয়াখালী জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে শিল্পকলা একাডেমির কার্যক্রম হয়। করোনার পরে শিল্পকলা একাডেমির তেমন কোন প্রোগ্রাম হয় নি। তবে করোনার আগে জেলার মহোদয় শিল্পকলা একাডেমিকে আমন্ত্রণ জানাত তাঁরা এসে কালচারাল প্রোগ্রাম করে যেতো। যেমন বলা হতো বিজয় দিবস উপলক্ষে জেলা প্রশাসক স্যার আসবেন প্রোগ্রামের আয়োজন করতে হবে। তাঁরা একটা বাজেট দিতো, আমরা সম্মতি দিলে জাতীয় প্রোগ্রাম করত। কিন্তু জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে সংস্কৃতিক চর্চায় আপনাদের অবদান সম্পর্কে শিল্পকলা একাডেমি জেলা কালচারাল অফিসার

বলেন, “আসলে সত্যি কথা বলতে আমি শিল্পকলা একাডেমির স্যার হিসেবে গত পাঁচ বছর ধরে নিয়োজিত আছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত ঢাকার থেকে আমি কোন ধরনের ডাক পাইনি সংস্কৃতি চর্চার জন্য। আমি মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরনের পেপার-পত্রিকায় দেখি যে কারাগারের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতি কার্যক্রম হয়ে থাকে কিন্তু কারা কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কখনোই জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাথে যোগাযোগ করেন না। তারা নিজেরাই বাহির থেকে শিল্পী সংগ্রহ করে আনে এবং বিভিন্ন ধরনের জাতীয় দিবসগুলোতে এরা অংশ নিয়ে থাকে। আমাকে মাঝে মাঝে তারা অতিথি হিসেবে ডাকে কিন্তু সাংস্কৃতিক কার্যক্রম আরো বাড়ানোর জন্য বা সাংস্কৃতিক চর্চা অব্যাহত রাখার জন্য তারা আমার সাথে আলোচনা করেনা”।

এছাড়া পটুয়াখালী জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সমৃদ্ধির জন্য বেসরকারি সংস্থার অবদান বা অনুদান সম্পর্কে জানতে চাইলে ডেপুটি জেলার বলেন, বাহিরের কোন সংগঠন বা বেসরকারি কোন সংস্থার কোন অবদান কিংবা অনুদান এখানে নেই বা আসার কোন সুযোগ নেই। তারপরও এমন কোন অনুদান দিতে হলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালায় থেকে অনুমতি নিয়ে আসতে হবে। আর কারাগারের অভ্যন্তরে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সমৃদ্ধির জন্য আপনার নিজের একটি উদ্যোগের কথা জানতে চাইলে ডেপুটি জেলার জানান, আসলে এটা তো আমার উপর নির্ভর করে না এটা নির্ভর করে জেলার মহোদয়ের উপর। তারপরও আমাদের জেলার মহোদয় বেশ সংস্কৃতিমনা। তার সাথে আমার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনে দুর্বলতা আছে। এখনকার কালচারাল অফিসার কামরুজ্জামান সাহেবের সাথে আমার বেশ ভালো সম্পর্ক আছে। আমি তার সাথে বসে আলোচনা করবো কীভাবে আমরা জেলের মধ্যে কালচারাল প্রোগ্রাম করতে পারি। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকা অবস্থায় অনেক কালচারাল প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছি। কালচারাল প্রোগ্রাম সম্পর্কে আমার বেশ জানা শোনা আছে।

বরগুনা জেলা কারাগার

১৯৬৯ সালে উপ কারাগার হিসেবে যাত্রা শুরু করে এই কারাগারটি। কালের বিবর্তনের সাথে সাথে ১৯৮৬ সালে উক্ত কারাগারটি জেলা কারাগারে রুপান্তরিত হয়। বরগুনা জেলা কারাগারের আয়তন ৪ একর। কারাভ্যন্তরে জমির পরিমান ১.৯৭ একর এবং বহিঃস্থ জমির পরিমান ২.০৩ একর। কারাভ্যন্তরের জমির উপর বন্দী ব্যারাক, মহিলা ওয়ার্ড, সেল ভবন, রান্নঘর, হাসপাতাল, শিশু ওয়ার্ড, পুকুর, কারা ক্যান্টিন, সবজি বাগান, ফুলের বাগান এবং খেলার মাঠ রয়েছে। বরগুনা জেলা কারাগারে মোট কারাবন্দী আছে ৪০৮ জন। গড়ে প্রতিদিন ৪০০ শতাধিক বন্দী অত্র কারাগারে অবস্থান করেন।

বরগুনা জেলা কারা তত্বাবধায়ক বলেন, কারাগারের অভ্যন্তরে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড আগে প্রতি বছরই হতো। তবে করোনার পর থেকে আপাতত বন্ধ আছে। আমি কর্মরত থাকলে এবছর পহেলা বৈশাখ উজ্জাপন করবো। সংস্কৃতিক প্রোগ্রামের জন্য আলাদা কোন সরকারি বাজেট নেই। তবে আমরা নিজেদের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম পরিচালনা করি। বরগুনা জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে শিল্পকলা একাডেমির কার্যক্রম হয় কিনা? এর উত্তরে তিনি বলেন, বরগুনা জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে শিল্পকলা একাডেমির কার্যক্রম হয়। গত কারা দিবসে আমরা কারা কর্তৃপক্ষ পিরোজপুর শিল্পকলা একাডেমিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। সেখানে জেলা প্রশাসক উপস্থিত ছিলেন, সমাজ সেবা অধিদপ্তরের উপ পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। প্রোগ্রামে শিল্পকলার শিল্পীরা নাচ, গান, কবিতা আবৃতি করেন।

বরগুনা জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সমৃদ্ধির জন্য বেসরকারি সংস্থার অবদান বা অনুদান দেওয়া হয় কিনা এর উত্তরে তিনি জানান, বরগুনা জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে সর্বসাধারণের প্রবেশ সংরক্ষিত। তাই বেসরকারি কোন কিছুর অবদান বা অনুদানের প্রশ্নই আসে না। কারাগারের অভ্যন্তরে সাংস্কৃতিক

কর্মকাণ্ড সমৃদ্ধির জন্য নিজের উদ্যোগে আমি শেখ রাসেল দিবসে কারাবন্দী পুরুষ দিয়ে গান, কৌতুক ও অভিনয়ের আয়োজন করিয়েছিলাম। ভবিষ্যতে ওদের নিয়ে আরও কিছু কারাগারের অভ্যন্তরে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার ইচ্ছে আছে।

ভোলা জেলা কারাগার

১৯৯৩ সালে ১০ একর জমির ওপর নির্মাণ করা হয় ভোলা জেলা কারাগার। এ সময় একতলা বিশিষ্ট শাপলা ও দোতলা বিশিষ্ট করবি নামে দুটি কয়েদিদের বাসস্থানসহ আন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। ভোলা জেলা কারাগারে বন্দীর ধারণক্ষমতা ১০০ জন। কিন্তু বর্তমানে এখানে কারাবন্দীর সংখ্যা মোট ৫৩৮জন।

ভোলা জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অতিথিশিল্পীদের পাশাপাশি কারাবন্দীরা অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা গান করেন, কৌতুক করেন। সমাবেত সঙ্গীত পরিবেশন করেন। কেউ আবার কবিতা আবৃতি করেন। ভোলা জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সমৃদ্ধির জন্য বেসরকারি সংস্থার অবদান বা অনুদান সম্পর্কে কারা তত্বাবধায়ক বলেন, ভোলা জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সমৃদ্ধির জন্য বেসরকারি সংস্থার অবদান বা অনুদান এর কোন সুযোগ নেই। কারাগার যেহেতু একটা স্পর্শকাতর যায়গা তাই এখানে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত। কারাগারের অভ্যন্তরে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সমৃদ্ধির জন্য নিজের একটি উদ্যোগের কথা প্রসঙ্গে তিনি জানান, আসলে আমি তেমন উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারি নি। তবে বিভিন্ন জাতীয় প্রোগ্রামগুলোতে আমি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যবস্থা করি। গতবছর পহেলা বৈশাখে আমি আমার নিজের উদ্যোগে কারাবন্দী পুরুষদের দিয়ে হাডুডু খেলার আয়োজন করেছিলআম। সেখানে জেলা প্রশাসক মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। পুরষ্কার বিতরণীর আয়োজন করা হয়। এবছরও আয়োজন করবো।

জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে শিল্পকলা একাডেমির অংশগ্রহণ সম্পর্কে তৎকালীন জেলা কালচারাল অফিসার বলেন, ২০১৭ সাল থেকে আমি এই জেলা শিল্পকলা একাডেমি, ভোলাতে নিয়োজিত আছি। করোনার ঠিক পূর্বে কয়েকটি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড করেছি জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে। যেমন বিভিন্ন জাতীয় দিবস ছিল আমার মনে আছে একুশে ফেব্রুয়ারি, ১৬ই ডিসেম্বর, ২৬শে মার্চ, শেখ রাসেল দিবস, শিশু দিবস এসকল জাতীয় দিবসগুলোতে আমি নিজে ওখানে দায়িত্বে থেকে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করেছি। কিন্তু করোনার পরবর্তীতে আর এধরনের কোন কার্যক্রমে আমাকে ডাকা হয় না। আমি বিভিন্ন মাধ্যমের জানতে পারি যে ওখানে বিভিন্ন ধরনের কালচারাল অনুষ্ঠান হয় কিন্তু আমি ওখানে আর আগের মতো ডাক পাইনা। তাই বলতে পারি যে গত ২...৩ বছরে আমি এ কারাগারের অভ্যন্তরে কোন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলাম না। তবে যদি কারাকর্তৃপক্ষ আমাকে আমন্ত্রণ জানায়, আমি যে কোন মুহূর্তে যে কোন সময় যেতে আগ্রহী। কারাবন্দীদের কে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত করে ওদের শারীরিক এবং মানসিকভাবে যদি একটু আনন্দ দিতে পারি তাইলে সেটাই হবে আমার সার্থকতা।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিয়ে এক কয়েদি জানান, আমরা সবাই ভোলা জেলার কারাগারে ছিলাম সেখানে মাঝেমধ্যেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত। সেখানে কি ধরণের সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় জানতে চাইলে তিনি আরও জানান, বিভিন্ন ধরনের জাতীয় দিবস যেমন পহেলা বৈশাখ, ২৬ শে মার্চ, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৬ই ডিসেম্বর এইসব জাতীয় দিবসে অনেক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। আমরা ১৬ ই ডিসেম্বর এর জাতীয় প্রোগ্রামের সবাই জেলে ছিলাম। সেখানে দেখেছি জেলা প্রশাসকের এসেছে আরও অনেক বড় বড় উর্দ্ধতন কর্মকর্তা এসেছে। দুপুরে আমাদের জন্য স্পেশাল খাবারের ব্যবস্থা করেছেন জেলা প্রশাসক মহোদয়। এরপরে কারা দিবস ছিল। কারা দিবসে এখানে কারাবন্দীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছে। কারাবন্দীরা এখানে গান গেয়েছে, কৌতুক

করেছ্ অভিনয় করেছে। পহেলা বৈশাখে আমরা জেলে ছিলাম। পহেলা বৈশাখে আমাদের জন্য স্পেশাল খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল পান্তা-ইলিশ খাওয়ানো হয়েছিল। পহেলা বৈশাখে জেলখানার মধ্যে হাডুডু খেলার ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেখানে আমরা সবাই খেলেছি।

পিরোজপুর জেলা কারাগার

পিরোজপুর কারাগারটি ১৯১৮ সালে সাব জেল হিসেবে প্রতিষ্টিত হয়। পরবর্তিতে ১৯৮৫ সালে জেলা কারাগারে রুপান্তির হয়। কারাগারটির মোট ভুমির পরিমান ১.১২ একর। পিরোজপুর জেলা কারাগারে মোট বন্দী ধারণ ক্ষমতা ১৭৭ জন। বর্তমানে অবস্থান করছেন ১৪৫জন। কারাগরটিতে বতমানে মঞ্জুরীকৃত স্থায়ী পদ সংখ্যা ৭৪ জন। এখানে সরকারিভাবে নিযুক্ত ডাক্তার আছেন ১জন। কিন্তু শুন্য পোস্ট আছে ৩ টি। জেল হাসপাতালে নার্স আছেন ১জন।

পিরোজপুর জেলা কারা তত্বাবধায়ক এই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বিষয়ে বলেন, জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড প্রতিবছর হয়। সর্বশেষ হয়েছিলো শেখ রাসেল দিবস। দেখা যায় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে কারাবন্দীরা অংশগ্রহণ করবে কিনা এটা ওদের মন মানসিকতার উপর নির্ভর করে। আমরা কোন প্রকার জোর জুলুম করি না। আমরা প্রস্তাব দেই ওদের ইসসে হলে অংশগ্রহণ করে। গত শেখ রাসেল দিবসে দুজন কারাবন্দী পল্লিগীতি গান করেছিল। আর একজন কারাবন্দী একটি কৌতুক করেছিল।

পিরোজপুর জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে শিল্পকলা একাডেমির কার্যক্রম হয়। না। আমার জানা মতে এখানে কোন শিল্পকলা একাডেমির কোন কার্যক্রম নেই। তবে কোন সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের জন্য সাহায্য লাগলে তাঁরা সহায়তা করে। তিনি আরও জানান, পিরোজপুর জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সমৃদ্ধির জন্য আমি তেমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করতে এখনও পারিনি তবে আমি নিজের উদ্যোগে কোরআন শিক্ষার

ব্যবস্থা করে দিয়েছি। তারপর আমার একটা পরিকল্পনা আছে, জেলা শিল্পকলা একাডেমি থেকে আমি গানের প্রশিক্ষক নিয়ে আসবো। যেন সপ্তাহে একদিন ওরা গান শিখতে পারেন আপাতত এইটুকু পরিকল্পনা। এছাড়া বাংলাদেশ সরকার যদি আর্থিক অনুদান দেয় বা কালচারাল প্রোগ্রাম করতে আদেশ দেয় তবে আমরা তা সাদরে গ্রহণ করব। একজন সমাজসেবা অফিসার জানান, প্রতিবছর সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরে একটা বাজেট থাকে কারাবন্দীদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য যা যা দরকার সে ধরনের ব্যবস্থা করার জন্য। এখানে আমরা হারমোনিয়াম দিয়েছি, ঢোল দিয়েছি, মন্দিরা দিয়েছি। যেন কারাবন্দীরা অবসর সময়ে একটু গানবাজনা করে মানসিক শান্তি লাভ করতে পারে।

দিনাজপুর জেলা কারাগার

দিনাজপুর শহরের প্রানকেন্দ্রে ঐতিহ্যবাহী লোক ভবনের বিপরীতে জেল রোডসংলগ্নে প্রায় ২৯ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত এ কারাগারটি উত্তরবঙ্গের অন্যতম একটি বৃহৎ জেলা কারাগার হিসেবে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। কারাগারটি পুন: নির্মাণের ফলে বর্তমানে এটি একটি আধুনিক কারাগারে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এর বর্তমান ধারণ ক্ষমতা ৩১৫৩ জন। অন্তরীণ বন্দীর সংখ্যা গড়ে ১০০০-১২০০ জন।

দিনাজপুর জেলা কারা তত্ত্বাবধায়ক বলেন, আমি করোনা কালীন সময়ে দিনাজপুর জেলা কারাগারে জেলার হিসেবে যোগদান করি। তখন থেকে আমি তেমন কোনো কালচারাল প্রোগ্রাম হতে দেখিনি। পরিস্থিতি ব্যবস্থাপনার কারণে সেটা এখনও হচ্ছে না। তবে কয়েক দিন আগে একটা সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আমরা বিশেষ বিশেষ দিবসে কালচারাল প্রোগ্রামের আয়োজন করবো। এটার জন্য সরকারি কোনো বাজেট নেই। স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং আমাদের কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এই আয়োজন করা হবে। বিগত দশ বছরের রিপোর্টের ভিত্তিতে জানা গিয়েছে যে, দিনাজপুর জেলা কারাগারে কারা সপ্তাহ পালন করা হতো। পুরুষ বন্দীদের সক্রিয়

অংশগ্রহণ থাকলেও নারীদের ক্ষেত্রে তেমনটা ছিল না। তবে বর্তমানে সরকারী অর্থায়নে যদি কারা সপ্তাহ পালন করা হয় তাহলে নারী বন্দীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য আমাদের একটা প্রচেষ্টা থাকবে। কারা সপ্তাহে সাধারণত বছরের নির্দিষ্ট একটা সপ্তাহে নাচ, গান, নাটক, ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা হয়। ঢোল, তবলা, হারমোনিয়াম পুরুষ ওয়ার্ডে আছে। নারী ওয়ার্ডে শুধু হারমোনিয়াম আছে। পুরুষ বন্দীরা ফুটবল, দাবা, ভলিবল, তাস, হা-ডু-ডু ও লুডু খেলে অনেক সময় অবসর সময় পার করে। নারীদের মাঝে মাঝে লুডু খেলতে দেখা যায়।

কারাগারে দিনাজপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমির কোনো কার্যক্রম নেই। তবে জেলা শিল্পকলা একাডেমি এবং কারা কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে প্রতি মাসে বা বিশেষ বিশেষ দিবসে কালচারাল প্রোগ্রামের আয়োজন হলে নান্দনিক শিল্পচর্চার প্রসার ঘটবে। এই জন্য কারা কর্তৃপক্ষকে জেলা শিল্পকলা একাডেমিকে আহ্বান করতে হবে। বাজেটের পাশাপাশি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রয়োজন।

কুড়িগ্রাম জেলা কারাগার

উপকারাগার হিসেবে যাত্রা শুরু করা কুড়িগ্রাম কারাগারটি ১৯৮৭ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি জেলা কারাগারে রূপান্তরিত হয়। প্রায় ১৬ একর জায়গা নিয়ে গঠিত এই কারাগারের অভ্যন্তরীণ আয়তন (মূল কারাগার) ৩ দশমিক ৮৬ একর। বন্দীর ধারণ ক্ষমতা ও বর্তমান বন্দীর সংখ্যা কুড়িগ্রাম জেলা কারাগারে র্সবমোট বন্দীর ধারণ ক্ষমতা পুরুষ ১৪৫ জন ও মহলিা ১৮ জন র্সবমোট ১৬৩ জন। র্বতমানে অবস্থানরত বন্দীর সংখ্যা ৬০৫ জন। মোট ৬০৫ জন কারাবন্দীদের মধ্যে হাজতি পুরুষ ৪৭৮ জন, হাজতি মহিলা ২৪ জন এবং পুরুষ কয়েদি ৯৭ জন, মহিলা কয়েদি ৬ জন। এছাড়াও কারাবন্দী মায়েদের শিশু সন্তান আছে মোট ৩ জন। ১ টি ছেলে এবং ২টি মেয়ে।

উর্ধ্বতম কর্মকর্তার অনুমতিক্রমে সকল বন্দীদের অংশগ্রহণে বিশেষ দিবসে কারা অভ্যন্তরে কালচারাল প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। তবে পুরুষ বন্দীরা কালচারাল প্রোগ্রামের যে সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে নারীদের ক্ষেত্রে সেটা নেই। আনুমানিক বিগত ১০ বছর থেকে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে কুড়িগ্রাম জেলা কারাগারে কালচারাল প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। যেমন, আঞ্চলিক গান, নাচ, সংশোধন মূলক প্রতিরোধমূলক নাটক, কবিতা আবৃতি, সাহিত্য পাঠ ইত্যাদি। কুড়িগ্রাম কারাগারে আঞ্চলিক গানের (ভাওয়াইয়া) বেশ প্রসার রয়েছে। পুরুষদের আলাদা গানের দল রয়েছে। নারীদের নেই। এখানে বঙ্গবন্ধু কর্নারের পাশাপাশি লাইব্রেরির ব্যবস্থা আছে। সেখানে ধর্মীয় বই সহ ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকের বই রয়েছে। কারা অভ্যন্তরে বন্দীদের বিনোদনের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি রয়েছে, যেমন- ঢোল, হারমোনিয়াম, তবলা, খঞ্জনি ইত্যাদি। মহিলা ওয়ার্ডে উল্লেখযোগ্য কোন যন্ত্রপাতি নেই।

২০২২ সালের আগস্ট মাসে কুড়িগ্রাম কারাগারে দিনের আলোতে পুরুষ বন্দীদের অংশগ্রহণে মাদকের কুফল, নারী নির্যাতন, যৌতুক ইত্যাদি সচেতনতামূলক বিষয়ে নাটক করা হয়। এছাড়াও কারাগারে ঊর্ধ্বতম কর্মকর্তাদের পরিদর্শনকালে কারাবন্দীরা দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন। নিরাপত্তার কারণে কালচারাল প্রোগ্রাম বিশেষ দিবস ছাড়াও অন্যান্য দিবসে আয়োজন করা ঝুঁকিপূর্ণ। তাই পূর্ণ নিরাপত্তায় বিশেষ ব্যবস্থাপনায় নির্দিষ্ট দিবসে কালচারাল প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়।

এখানে কালচারাল প্রোগ্রামের জন্য সরকারি কোনো বাজেট নেই। স্থানীয় ব্যবস্থাপনায়, কারা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে কারাবন্দী এবং স্টাফদের নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কুড়িগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমি কারা অভ্যন্তরে বন্দীদের নিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিশেষ করে নাচ, গান, আবৃতি এবং ছোট ছোট নাটিকা। এই সকল প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান সুন্দর ভাবে করার জন্য অর্থের বিনিময়ে কুড়িগ্রাম শিল্পকলা একাডেমি থেকে যন্ত্রশিল্পীদের ভাড়া করে আনা হয়।

নীলফামারী জেলা কারাগার

নীলফামারী জেলা কারাগারটি ১৯১৫ খ্রি: সালে নির্মিত হয়। নীলফামারী জেলা কারাগারের ধারণ ক্ষমতা ২০০ জন যার মধ্যে পুরুষ ১৮০ জন এবং মহিলা ২০ জন। কিন্তু বর্তমানে সেখানে কারাবন্দী আছে ২২৮ জন।

বিশেষ বিশেষ দিবসে কালচারাল প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়। ২০২০ সাল থেকে করোনা মহামারীর কারনে বিশেষ দিবসে কোন কালচারাল প্রোগ্রামের আয়োজন করা হচ্ছে না। তবে সাহিত্যর্চচা করার জন্য বঙ্গবন্ধু কর্ণার সহ লাইব্রেরির ব্যবস্থা আছে। গত ২৭ শে সেপ্টেম্বর ২০২২ ইং তারিখে বর্তমানে দায়িত্বরত জেলার মোহাম্মদ মাসুদুর রহমানের তত্ত্বাবধায়নে নীলফামারী কারাগারে কারা লাইব্রেরি এবং বঙ্গবন্ধু কর্ণার তৈরি করা হয়। কারাবন্দীরা ইচ্ছে অনুযায়ী লাইব্রেরি থেকে বই সংগ্রহ করে বই পরতে পারেন। লাইব্রেরিতে সাধারণত ধর্মীয় বই সব থেকে বেশি রয়েছে। এছাড়াও দেশী বিদেশী সাহিত্যিকদের বই সংগ্রহে রয়েছে। পুরুষ ওয়ার্ডে হারমোনিয়াম, ঢোল, তবলা, বাশিঁ রয়েছে। মহিলা ওয়ার্ডে হারমোনিয়াম এবং ঢোল রয়েছে।

কারা অভ্যন্তরে সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম আয়োজনের ক্ষেত্রে জেলা শিল্পকলা একাডেমির কোনো কার্যক্রম নেই। নিরাপত্তা জনিত কারণে আমাদের নীলফামারী কারা কর্তৃপক্ষেরও কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। তবে কারা কর্তৃপক্ষ এবং জেলা শিল্পকলা একাডেমির সমন্বয়ে সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামের আয়োজন করা যেতে পারে। তবে এই ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রাণালয়ের অনুমতির প্রয়োজন।

ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগার

এটি ১৮৯২ সালে উপ-কারাগার হিসেবে স্থাপিত হয়। তারপর ১৯৮৪ সালে তা বর্তমান স্থানে সম্প্রসারিত হয় এবং জেলা কারাগার হিসেবে জেলার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এই জেলা

কারাগারের মোট জমির পরিমাণ ২.৮৩ একর; ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগারের বর্তমান বন্দী-ধারণক্ষমতা মোট ১৬৮ জন। এর মধ্যে পুরুষ ধারণ-ক্ষমতা ১৬৫ এবং মহিলা ধারণ-ক্ষমতা ০৩ জন। কিন্তু বন্দী আছে ৩৬৭ জন।

উর্ধ্বতম কর্মকর্তার অনুমতিক্রমে সকল বন্দীদের অংশগ্রহণে বিশেষ দিবসে কারা অভ্যন্তরে কালচারাল প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। তবে পুরুষ বন্দীরা কালচারাল প্রোগ্রামের যে সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে নারীদের ক্ষেত্রে সেটা নেই। ছোট আকারের কারাগার হওয়ায় স্বল্প পরিসরে নাচ, গান ও কবিতা আবৃতির আয়োজন করা হয়। ধর্মীয় কালচার হিসেবে কোরআন শিক্ষা, নামাজ শিক্ষা ও গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। দাবা, লুডু ও ব্যাটমিন্টন খেলার ব্যবস্থা রয়েছে। নারীরা সাধারণত লুডু খেলে থাকে। পুরষ ওয়ার্ডে ঢোল, হারমোনিয়াম, খোল ও করতাল থাকলেও নারী ওয়ার্ডে এই ধরণের যন্ত্রপাতি নেই। প্রয়োজনীয় সংবাদপত্রের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে ব্যতিক্রমি, সংবেদনশীল ও উত্তেজনাকর কোনো সংবাদ কারাবন্দীদের নিকট পৌছানো হয় না। বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে নারী পুরুষ উভয় ওয়ার্ডে টেলিভিশন সেটের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে শুধুই বিটিভি দেখার ব্যবস্থা আছে। করোনাকালীন পরিস্থিতির কারণে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম কমে গেছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পূর্ব নির্ধারিত বিধি মোতাবেক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হওয়ার প্রচেষ্টা চলছে। এখানে কালচারাল প্রোগ্রামের জন্য সরকারি কোনো বাজেট নেই। স্থানীয় ব্যবস্থাপনায়, কারা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে কারাবন্দী এবং স্টাফদের নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সংস্কৃতির চর্চাকে বৃদ্ধি করার জন্যে জেলা শিল্পকলা একাডেমিকে সংশ্লিষ্ট করা যেতে পারে। প্রতি মাসে বা সপ্তাহে শিল্পকলা একাডেমির প্রশিক্ষকের মাধ্যমে কারাবন্দীদের সমন্বয়ে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতে পারে। তবে ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগারে শিল্পকলা একাডেমির তেমন কোনো কার্যক্রম আমার সময়ে পরিচালিত

হয়নি বা এই ধরনের কোনো প্রস্তাবনা আসেনি এবং কারা কর্তৃপক্ষের দিক থেকেও কোনো ধরনের প্রস্তাবনা প্রেরণ করা হয়নি। এটা হওয়া দরকার।

গাইবান্ধা জেলা কারাগার

গাইবান্ধা জেলা কারাগারের জেলার বলেন, কালচারাল প্রোগ্রাম বলতে ধর্মীয় কালচারের ওপর আমি বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকি। প্রতিদিন ফজরের নামাজের পর আমি নিজে অর্থসহকারে কারাবন্দীদের কোরআন তেলোয়াত করে শোনাই। হিন্দু মুসলিম থেকে শুরু করে অন্যান্য সকল ধর্মের কারাবন্দীরা অর্থসহ কোরআন তেলোয়াত বেশ উপভোগ করে এবং উৎসাহিত হয়। এখানে প্রতি মাসে দুইবার মিলাত-মাহফিলের আয়োজন করা হয়। ১০০ নবীর নামে মিলাত করা হয়। তবে ঊর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষের নিদের্শে বিশেষ বিশেষ দিবসে নাচ, গান, আবৃতি, ইসলামিক সঙ্গীত ও প্রতিযোগীতামূলক খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। এই সকল ক্রিয়াকর্মে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ কম থাকে। বর্তমান সময়ে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা গাইবান্ধা জেলা কারাগারের ইতিবাচক দিক। কারা অভ্যন্তরে পুরুষ ওয়ার্ডে নাচ, গান ও নাটক করার জন্য একটি মঞ্চ রয়েছে। কিন্তু নারী ওয়ার্ডে মঞ্চ নেই।

গাইবান্ধা জেলা শিল্পকলা একাডেমির কোনো কার্যক্রম নেই। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় পুনর্বাসনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বর্তমানে সেটাও বন্ধ আছে। তবে তাদের কার্যক্রম দ্রুতই শুরু হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে।

কক্সবাজার জেলা কারাগার

কক্সবাজার জেলা কারাগার ২০০১ সালে স্থাপিত হয়। বর্তমানে কক্সবাজার কারাগারের ধারণক্ষমতা মোট ৮২৩ জন, কিন্তু বন্দী রয়েছে ৩১০০ থেকে ৩২০০ জন। নারীবন্দী রয়েছে ১৩০ থেকে ১৪০জন। মায়ের

সাথে শিশুবন্দীর সংখ্যা ৩৭ জন। ১ হাজারের মতো রোহিঙ্গা কয়েদি রয়েছে। ধারণ ক্ষমতার চেয়ে প্রায় ৪ গুন বেশি বন্দী রয়েছে। বন্দীদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি মাদক মামলার আসামি যাদের অধিকারী রোহিঙ্গা।

জেলা কারাগার বিষয়ে জেল সুপার জানান যে, কক্সবাজার জেলা কারাগারে মোট কয়েদিদের সংখ্যা নারী এবং পুরুষ মিলিয়ে সর্বমোট ৩২০০ জন। যা ধারণ ক্ষমতার প্রায় ৮ গুন। নানা অপরাধভিত্তিক মামলার ধরন অনুযায়ী কয়েদিদের শ্রেনী বিন্যাস বিদ্যমান আছে। হাজতবাসীদের জন্য খাবার ব্যবস্থাপনা দিনে ২ বার ভাত দেওয়া হয়- দুপুর, রাতে এবং সকালে খিচুড়ি অথবা ডাল রুটি। কারাগারের সেনিটেশন ব্যাবস্থপনা সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে-প্রত্যেকের ওয়ার্ডের ভেতরে ২ টা করে পুরুষদের জন্য আলাদা ল্যাট্রিন রয়েছে এবং নারীদের জন্য আলাদা ল্যাট্রিন রয়েছে। একজন নারী কয়েদির সাথে ৬ বছর পর্যন্ত একটা শিশু কারাগারে থাকতে পারে। এবং ঐ শিশুর জন্য খেলাধুলা, পড়ালেখার সমস্ত ব্যাবস্থা রয়েছে। তাদের এই সব সরেঞ্জাম দিয়েছে ICRC।

কারাগারের অভ্যন্তরে কালচারাল প্রোগ্রামের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে যদি বলতে হয়, আমারদের এখানে হাজতি এবং কয়েদিদের বিনোদনের জন্য হারমনিয়াম, গীটার, তবলা, বড় LED মনিটর ইত্যাদি সরেঞ্জাম আছে। তারা চাইলে সকাল থেকে তাদের মত করে সংস্কৃতি চর্চা করতে পারে। এছাড়াও প্রত্যেক দিবসে আমরা বড় প্রোগ্রাম করি। আমরা শেষ বার ১৬ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠান করেছিলাম। আমরা বাহির থেকে শিল্পী এনেছিলাম এবং আমাদের জেলের শিল্পী দিয়ে এই প্রোগ্রাম গুলো করে থাকি। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য সরকারি কোন বাজেটের প্রয়োজন হয় না। কারন বেশির ভাগ সময় এখান কার শিল্পীরাই অনুষ্ঠানগুলো করে থাকে। আপাতত কারাগারে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সমৃদ্ধির জন্য বেসরকারি সংস্থার কোন ভূমিকা নাই। যদি কেউ নিজ থেকে করতে চায় আমরা স্বাদরে গ্রহণ করবো। জেলের অভ্যন্তরে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড হয়। প্রতি দিন কয়েদিরা তাদের মত করে গান, কবিতা, হারমোনিয়াম বাজায়। আমাদের এখানে বড় এলইডি টিভি আছে সেটায় সচেতন মূলক প্রোগ্রাম

হয় সেটা দেখে। বিভিন্ন দিবস গুলোতে যেমন: ২১ ফেব্রুয়ারি, ২৫ মার্চ, ২৬ মার্চ, ১৫ অগস্ট, ১৬ দিসেম্বর, ঈদ এই দিবসগুলো আমরা পালন করে থাকি। লাস্ট ১৬ই ডিসেম্বর আমরা বড় করে অনুষ্ঠান করেছি। এবং এই দিবসগুলো আমাদের জেলের কয়েদিরাই অংশগ্রহণ করে থাকে।

কয়েদিদের আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক খেলাধুলার মধ্যে আছে ফুটবল, ক্রিকেট, ক্যারাম, দাবা ইত্যাদি। কারাগারে শিল্পকলা একাডেমির কার্যক্রম নাই, আমার কখনো তাদেরকে পাইনি বা আমাদের সাথে যোগাযোগ করেনি। কারাগারে সমাজসেবা অধিদপ্তরের নানা ধরনের কার্যক্রম আছে যেমন ট্রেনিং করায় যেমন দর্জির কাজ, সেলাই কাজ, হ্যান্ডিক্র্যাফ্ট মূলত কর্ম মুখি কাজ শেখায়।

কয়েদিদের আচরণ সংশোধনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ভূমিকা আছে কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, অবশ্যই, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠাণ হলে তাদের মন ভালো থাকে কু-কর্ম, মারামারি, মাস্তানি অথবা হতাসা থেকে মুক্তি পেতে পারে। এক কথায় সাংস্কৃতিক চর্চার ভূমিকা অপরিসীম।

জেলা কারাগার বিষয়ে সমাজসেবা অধিদপ্তরে একজন কর্মকর্তা বলেন, সরাসরি বা সশরীরে আপনার কারাগার ভিতর পরিদর্শন করার সুযোগ হয়, প্রতি তিন মাস পর পর ডিসি মহোদয় ও কয়েদিদের সাথে আমাদের একটি মিটিং থাকে। সেই মিটিংকে আমরা বলি ত্রৈমাসিক সভা। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন ডিসি মহোদয়। আমি ভেতরে যখন যাই তখন কয়েদিদের দিকে তাকালে মনে হয় তারা যেন তীর্থের কাকের মত করে চেয়ে আছে, আমার মনে হয় তারা বলতে চায় এখানে থাকার চেয়ে মৃত্যু ভালো। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বন্দীদের মানসিক অবস্থা সুবিধাজনক নয়। আমার মনে হয় ওরা মানসিক দুশ্চিন্তা গ্রস্থ, নিঃসঙ্গতা অনুভব করে। ওদের মনোসামাজিক সাপোর্ট দরকার। কারাগারে থাকতে থাকতে বন্দীদের একঘেয়েমিতা চলে আসে।

কারাগারে নারী কয়েদিদের নিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম চালু আছে। আমরা তাদের কে সেলাই কাজ শেখাই। এবং তাদের যে শিশু রয়েছে তাদের পড়াশুনার ব্যাবস্থা করি। আমরা জেলের ভেতরে প্রশিক্ষক হিসেবে এক্সপার্ট একজনকে দৈনিক মজুরী হিসাবে ভাড়া নেই। তারা কয়েদিদের কে ট্রেনিং করায়। তাছাড়া যেসমস্ত কয়েদি হাজত থেকে বের হয়, আমরা তাদেরকে ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে থাকি। যেমন এক পরিবার কে ৩০, ০০০ টাকা দেওয়া হলো সেটা কাটা ঐ ব্যাক্তি নানা ধরনের ব্যাবসা বা সবজির দোকান দিয়েছে। তারা উক্ত টাকাটা বিনা সুদে মাসে মাসে ফেরত দিতে পারবে। এই ঋণটা একজন হাজতিকে বা কয়েদিকে ৩ বার পর্যন্ত দিতে পারে।

কারা পরিদর্শন কালে আমি বিশেষ কোন সংস্কৃতি চর্চা করতে দেখিনি। বিশেষ দিবসগুলোতে যতটুকু সম্ভব তারা আনন্দ করে তাছাড়া বাদবাকি টাইম কাটায় অবসরে। কারা-অভ্যন্তরে সংস্কৃতি চর্চা বা বিনোদনের ব্যাবস্থা করলে তাদের কেমন ধরনের লাভ হবে এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, জেলের ভেতরে তারা সারাক্ষন তাদের পরিবারের কথা চিন্তা করে, তারা মানসিকভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে, তারা মানুষিক ও শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে, মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে, ইত্যাদি সমস্যা থেকে তারা পরিত্রান পেতে পারে। গান, নাচ, নাটক, কবিতা, গল্প, ছড়া, পদ্ম, গদ্য, অঙ্কন, লেখা লেখি, বই পড়া ইত্যাদির মাধ্যমে তারা সুস্থ্য থাকতে পারে। তাদেরকে সংশোধন করা যেতে পারে একটু বিনোদনের মাধ্যমে। সংস্কৃতি চর্চা করলে তাদেরকে কিছুক্ষণের জন্য খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে এবং তাদের সময় কেটে যাবে, একঘেয়েমি লাগবে না, বর্তমান পৃথিবীর সাথে তারা খাপ খাওয়াতে পারবে। পরিবারের কথা ভেবে অসুস্থ হবেনা, কারন সংস্কৃতিচর্চা করলে একজন আরেক জনের সাথে এক ধরনের ভালো সম্পর্ক তৈরি হয় ফলে পরিবারের কথা কিছু সময়ের জন্য হলেও তারা ভুলে থাকতে পারবে। তাদের মনের ভেতরে যে না বলা কথাগুলো বলবার সুযোগ পাবে। ব্যথা-কষ্ট, আঘাত এগুলো

প্রকাশ করার ফলে তাঁর মানসিক দুশ্চিন্তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে সুতরাং জেলের ভেতরে সংস্কৃতিচর্চা অতীব জরুরি এবং যুগোপযোগী একটি চিন্তা বলে আমি মনে করি।

কক্সবাজার জেলা কারাগারের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড প্রসঙ্গে স্থানীয় একজন সংস্কৃতিকর্মী বলেন, কারাগারের অভ্যন্তরে কালচারাল প্রোগ্রামের কোনো ধরনের ব্যাবস্থা নাই। ওখানে দুনিয়ার সবচেয়ে খারাপ কাজ হয় যদি মনে চায়। এবং সব ধরনের ক্রাইমও হয়। একটা ওয়ার্ডের ধারণ ক্ষমতা যদি ৫০ জনের জন্য থাকে তাহলে সেখানে ১৫০ থেকে ২০০ জন থাকতে হয়। কক্সবাজার কারাগার অনেক অপরিস্কার এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। তবে বিনোদনের জন্য বিশেষ দিবস বেছে নেওয়া হয়। যেমন ২১শে ফেব্রুয়ারি, ৭ই মার্চ, ২৬শে মার্চ, ১৫ই আগস্ট, ১৬ই ডিসেম্বর। এছাড়া আর তেমন কিছু হয় না। যদি কারোর মন চায় একটু গুন গুন করে গান করতে তাহলে সে তার মত করে গানগায়। কিন্তু খুব বিশেষ সুব্যাবস্থা নাই। তাছাড়া আমার জানা মতে কারাগারে শিল্পকলা একাডেমির কার্যক্রম নাই, আমারা কখনো তাদেরকে যেতে শুনিনি। কক্সবাজারে একটা শিল্পকলা একাডেমি আছে সেটাই ভালোভাবে চলে না। আমরা সাংস্কৃতি কেন্দ্রে এবং পাবলিক লাইব্রেরির হলে কোন রকম থিয়েটার করি। আর আসলে জেলের অভ্যন্তরে নিয়োমিত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড করাও সম্ভব না। সেখানে থাকার, শোয়ার, বসার জায়গায়া নাই সংস্কৃতিক চর্চা কিভাবে হবে। তবে কয়েদিরা জেলের অভ্যান্তরে সংস্কৃতির চর্চা হিসেবে গান, কবিতা, গল্প ইত্যাদি করে। সেটা তাদের মতো করে।

কয়েদিদের আচরণ সংশোধনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ভূমিকা আছে বলে কি আপনি মনে করেন? এর উত্তরে তিনি জানান, হ্যাঁ অবশ্যই আছে, কারন তারা সারাক্ষন জেলের ভেতরে শুয়ে, দাঁড়িয়ে, বসে সময় কাটায়। যদি তারা এই ধরণের কর্মকাণ্ড করতে পারে তাহলে তারা শারীরিক এবং মানসিকভাবে সুস্থ থাকে বলে আমি মনে করি। কারণ জেলের ভেতরে তাদের কোন কাজ নাই, যার কারণে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বা শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে

পড়তে পারে। মানসিকভাবেও ভেঙে পড়তে পারে এবং এই ধরনের নানান সমস্যা দেখা দিতে পারে। যদি তারা একটু গল্প করার সুযোগ অথবা একটু বাদ্যযন্ত্রের সাথে গান গাওয়ার সুযোগ অথবা কবিতা আবৃতি বা লেখালেখির সুযোগ তারা পায় অথবা কেউ যদি এই ধরনের প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধান করে তা হলে তারা মানসিকভাবে এবং দৈহিকভাবে সুস্থ্য থাকবেন। বিশেষকরে কারাগারের ভেতরে মাদকের ছড়াছড়ি আছে। তারা চাইলে সবই পায়। তাতে করে একজন কয়েদি দুর্বল থেকে আরো দুর্বল হয়ে পড়ে এবং নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। আমারা সবাই জানি জেলখানা বা কারাগার মূলত সংশোধনাগার তাহলে যদি সেখানে গিয়ে আরো বেশি নষ্ট হয়ে পড়ে তাহলেতো সমাজের জন্য আরও বড় ভয়ানক। সেই জায়গা থেকে কারাগারে যদি সংস্কৃতি চর্চা করা যায় তাহলে অনেক ভালো উদ্যোগ বলে আমি মনে করি। সাথে সাথে এই ধরনের চিন্তাকে আমি সাধুবাদ জানাই এবং সফলতা কামনা করি।

১.২ কারাগারের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ও সামগ্রিক পরিবেশ বিষয়ে কারাবন্দিদের অভিজ্ঞতা

কারাবন্দীর অভিজ্ঞতা- ১

গবেষক: আপনার কারাগারে বন্দি থাকার সময়ের অভিজ্ঞতা জানান।

নাফিস (ছদ্মনাম): বর্তমান বাংলাদেশে যে জেলকোড প্রচলিত আছে তা প্রণীত হয় ১৮১২ সালে। এবং এটা এখনো চলছে। ঐ সময়ে ব্রিটিশ শাসন চলছিল এবং ঐসময়ের প্রেক্ষিত ভিন্ন ছিল। আর এখনকার ২৮০ বছরের বেশি পার হয়ে গিয়েছে। এখন যেটা হয়েছে অনেক কিছুই ইন্টার্নালি এডোপ্ট করা হয়েছে সিস্টেমের মাধ্যমে। দেখা যাচ্ছে, মানুষগুলো পরিবর্তিত হয়েছে, প্রশাসনও পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু কাগজে-কলমে কিন্তু এই পরিবর্তনগুলোর কোন ভ্যালিডেশন নেই। এরপরেও বেশকয়েকবার জেলকোড নিয়ে কাজ হয়েছে, এখনো হচ্ছে। যেটা আন-অফিসিয়ালি তারা করেন তার সবটাই বৈধ না আবার। বেশিরভাগ নিয়মই ২০০ বছর আগেকার।

আমি প্রথমে পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে বলি, পরে নিজের অভিজ্ঞতাগুলো বলব। মূলত যারা জেল খাটছেন, তাদের মধ্যে ২টি ভাগ রয়েছে। একটি হচ্ছে কয়েদি, আরেক ধরন হচ্ছে হাজতি। হাজতি হলেন যারা মূলত আন্ডার ট্রায়াল অর্থ্যাত তিনি আদালতে বিচারাধীন। যাদের মামলা চলছে কিন্তু এখনো সাজা হয় নাই। আর যাদের সাজা হয়ে গেছে তারা হলেন কয়েদি। এইটা বাইরের মানুষ অনেকেই জানেন না। তারা মনে করেন সবই একই। "ইউ ক্যান নট ট্রিট দেম এজ ক্রিমিনালস। " তাদের আটক রাখা হয় এবং জেলের দায়িত্ব হচ্ছে তাদের যেন কোন ক্ষতি না হয়। মৌলিক চাহিদা যেন পূরণ করা হয়। এটা অবশ্য সবার জন্য একই। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা নিশ্চিত করা হয় জেল থেকে। আর কয়েদিদের সাজার সাথে সাথে কিছু কাজও করতে হয়। হাজতিদের কিন্তু এরকম করতে হয় না। কেননা তাদের অপরাধ তো এখনো প্রমাণিত হয়নি। কিন্তু আদালত তাদের আটক রাখার সিদ্ধান্ত নেন নিরাপত্তাজনিত কারণে।

এর আগে আপনাকে অপরাধের সংজ্ঞাটা বুঝতে হবে। মূলত যেধরনের কাজ সমাজের স্বাভাবিকতাকে বিঘ্ন ঘটায়। সমাজে তো সব মানুষ মিলেমিশে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তো যেই কাজ স্বাভাবিকতাকে বাধাগ্রস্থ করে সেটাই অপরাধ। আর যারা এটা করে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয় কেননা তারা সমাজে বসবাসের অযোগ্য। তাদেরকে পাঠানো হয় কারাগারে। ভাবা হয় তাদেরকে শাস্তি দিলে তারা আর ঐ কাজ করবে না। আধুনিক কারাগারের ধারণায় সংশোধনটা গুরুত্ব পায়। সংশোধনের আগের উপায়টা ছিল কেবল শাস্তি আর এখন তাকে প্রোডাকটিভ কাজের সাথেও যুক্ত করা হয়। কিন্তু সেটা মুখে-মুখে, কাগজে কলমে নাই। আপনি যদি কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বললে দেখবেন তারাও এটাই বলবে যে, কারাগার তো সংশোধনের জায়গা। কিন্তু সংশোধন কিভাবে করবে সে ব্যাপারে তাদের কোন ধারণা নাই। আর আমি ভেতরে তাদের মুখের কথাগুলোই কাজে লাগিয়েছি।

আমি যেটা বলতে চেয়েছি যে, মানুষজন কেউ ফিজিক্যালি অপরাধ করে না। একসময় ফিজিক্যাল চাহিদা মানে যেটা ছিল পেটের দায়ে চুরি করতো। আমি কিছু করতে পারছি না। তাই বাধ্য হয়ে চুরি করছি। কিন্তু বাধ্য হয়ে করি আর যেভাবেই করি না কেন, সেটা অপরাধ। কারণ তুমি অন্যকারো অধিকার ক্ষুণ্ণ করছো। মূলত মানুষ যখনেকটা কাজ নিজের কাছে ঠিক মনে করছে কিন্তু সমাজ ঠিক মনে করছে না, তখন সে সমাজের একটা ধারণাকে প্রত্যাখান করছে। ফলে তার চিন্তাধারায় একটা ভিন্নধারণা আসছে তার নিজের সম্পর্কে বা সামগ্রিক বিষয়টা নিয়েই। ফলে তার দৃষ্টিভঙ্গিতে ভিন্নতা আসছে বা ভুল ভাবছে। ফলত যেটা পরিবর্তন করা জরুরি সেটা হলো মনস্তত্ব। ঐটাই বোঝানো যে তুমি যেটা চুরি করছো সেটা আরেকজন কষ্ট করে উপার্জন করছে; ক্যাপিটালিস্ট সমাজে যা হয় আরকি যে তার ঔনারশিপে তুমি হাত দিতে পারবা না।

যাই হোক এই চিন্তাটা তো মানুষকে বোঝাইতে হয় যে যারা এইটা এপ্লাই করতেসে তারা তো এই ধারণাটা এক্সেপ্ট করে নিসে যে যত বেশি কষ্ট করবে তার প্রাপ্য তত বেশি। সে এফোর্ট দিচ্ছে, এফোর্টের বিনিময়ে সে উপার্জন করছে আর যে এফোর্ট দিতে পারে না বা ঐ জায়গাটায় পৌঁছাতে পারে নাই সে আসলে পাবে না- এরকম একটা জিনিষ। যাই হোক, আল্টিমেটলি মানুষকে পিজিক্যালি, মেন্টালি আটকায়ে রাইখে কোনো লাভ নাই। মানে আসলে কী করছি আমি। ঐ শাস্তিটার তো দুইট এফেক্ট থাকে, প্রত্যেকটা জিনিষেরই। ইট ক্যান টার্ন পজিটিভলি, ক্যান টার্ন ভেরি গুড। আমি একটা শিশুকে থাপড় দিলাম, ঐ থাপ্পড়টা না খায়ওয়ার জন্য শিশুটা সারাজীবন চেষ্টা করতে পারে। আবার, "থাপ্পড় তো খায়ে ফেলসি- আরকি?"ও হইতে পারে। ইউজড টু হয়ে যাচ্ছে অথবা নেক্সট টাইম এমনভাবে কাজটা করবে যাতে ধরা না পড়ি।

মানুষ এমনভাবে ডিজাইন্ড যে ওকে যেটা নিষেধ করা হয় সেটাই বেশি বেশি করে। তো মানুষ আসলে ফাক-ফোকর খোজার চেষ্টা করে। তো প্রশ্নটা তখনই ওঠে যে, আমি যখন ভয় যদি মানুষকে ঠিক করার চেষ্টা

করছি, তখন সেটা কতটুকু কাজ করবে। তো ব্যাকগ্রাউন্ডে অনেক কথা বলে ফেললাম। তো আমি ঐ ভাবনাটাই ভেবেছিলাম যে কোনোভাবে যদি মানসিকভাবে ওদেরকে এনহ্যান্স করা যায়। আপনি যেই কথাটা বললেন সেই জন্যেই এই কথাগুলা বলা। প্রত্যেকের মধ্যেই ভালো- খারাপ দিক আছে। কোনো মানুষ পাবেন না যে একেবারে শতভাগ ভালো। সবার মধ্যেই কিছু না কিছু খারাপ অভ্যাস থাকে যেগুলো আমরা ইগনোর করে যাই। যেইটা গুরুত্বপূর্ণ যে কে কতটা তার ভালো দিকগুলোকে ব্যবহার করছে। সম্ভাবনা সবার মধ্যেই আছে। এখন যদি সমাজে সেগুলোকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার সুযোগ থাকত তাহলে মানুষ সম্ভবত খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলো সামনে আনত না।

এখন আমার অভিজ্ঞতা থেকে জেলের ৮০ ভাগ মানুষই কেবল পরিস্থিতির শিকার। আমার নিজের দেখা থেকে আমি যেটা পেয়েছি যে, ৩ ধরনের মানুষ জেলে যায়। প্রথমত, যদি বাদীর থেকে তার ক্ষমতা কম হয়। দ্বিতীয়ত, বাদীর থেকে তার টাকা কম হয়। তৃতীয়ত, কেবলই ভুল সময়ে ভুল জায়গায় থাকার কারণে। যেমন জানেন, পুলিশদের বিভিন্ন কোটা আছে যে এতগুলা মামলা করতে হবে। এখন সে সারাদিন মামলা করে নাই। রাতের বেলা ধরে ড্রাগকেস দিয়ে দিলো মানে কপাল খারাপ। আর এই তিনটার মধ্যে আসলে কোনটাই ক্রিমিনালের সংজ্ঞা না। আমার যদি আরেকজনের থেকে টাকা কম থাকে তাহলে কি আমি ক্রিমিনাল? আমার যদি আরেকজনের থেকে ক্ষমতা কম থাকে তাহলে কি আমি ক্রিমিনাল? তো শতভাগ ক্ষেত্রেই এইটা সত্য। বরং যারা বড় বড় ক্রাইম করে, তারা কেবল অর্থ এবং ক্ষমতার কারণে তাদের জেলে যেতে হয় না। গেলেও তারা ১/২ মাসের মধ্যে সুন্দর করে বের হয়ে আসে। আর অসংখ্য মানুষ যারা কিছু না করেও বা সামান্য অপরাধ করে যেমন; ১ স্টীক গাঁজাই খাইসে, তাকে ২০০ পিস ইয়াবার মামলা দিয়ে পাঠায়ে দিসে। এবং তারা বছরের বছরের জেল খাটতেসে। এইটা অহরহ দেখা যায় জেলে। এছাড়া ক্রিমিনালরাও যায়, তবে অন্য কারণে যায়।

যেমন, রাজনৈতিক কারণে যায়। কয়দিন আগে এক মহিলাকে এরেস্ট করা হইসে হ্যারাস করার অপরাধে। এরেস্ট করার পর ফেসবুক পোস্টে ভরে গেছে যে তাকে এরেস্ট করা হইসে। এরপর কী? তার জেলে গিয়ে কি হবে। সে ঐখানে আরামে থাকবে, খাবে, ঘুমাবে। তার কোনো চিন্তা নাই। কয়েকদিন পর জামিন নিয়ে বেরও হয়ে যাবে। কিন্তু তার ঐ মাইন্ডসেটটা কী বদলানো যাবে? কিন্তু সবাই মনে করছেযে তাকে এরেস্ট করা হইসে, তার উচিত শিক্ষা হইসে। কিন্তু জেলে আসলে অনেক সুবিধাই আছে যা জেলের বাইরে নাই। জেলের বাইরে অনেকেরই থাকার জায়গা নাই, খাওয়ার কিছু থাকে না। কিন্তু জেলে সরকারই আমাকে ঘুমানোর জায়গা দিচ্ছে, খাওয়াচ্ছে। অর্থ্যাত, সকল ধরনের মৌলিক চাহিদা পূরণের সুযোগ আছে ভেতরে আছে।

গবেষক: তারমানে আপনি বলতে চাচ্ছেন, জেলের ভেতরকে যদি আমরা একটা সমাজ বা কমিউনিটি হিসেবে চিন্তা করি তাহলে ওখানে সব সুযোগ-সুবিধা আছে। তাহলে তো জেলের ভেতর অপরাধে যুক্ত হওয়ার কথা না। কিন্তু তারপরও তো হচ্ছে। সেই অপরাধগুলো তাহলে কেন?

নাফিস (ছদ্মনাম): কারণ, নিয়ম হচ্ছে সব বেসিক নিডস ফুলফিল করা। ট্যাগলাইন হচ্ছে, "রাখিব নিরাপদ, দেখাব আলোর পথ। " তো প্রথম কথা হচ্ছে সবাইকে নিরাপদে রাখতে হবে। জেলে যদি কোনো টর্চার হয় এবং কোর্টে যদি দেখানো হয় সেটা তবে সম্পূর্ণ অবৈধ। আমি এখন আপনাকে ভেতরের কাহিনী বলি, আমি যতটুকু ট্রান্সিশন দেখেছি। আমি পুরান ঢাকার পুরান জেলে ছিলাম। পরে আমি নতুন জেলে গেলাম। এই দুইটার মধ্যে হিউজ ডিফরেন্স। এরমধ্যে অনেক কিছু চেঞ্জ হইসে। আমি ঐ সময়টার মধ্যে ছিলাম জন্যে আমি বলতে পারব আগে কী ছিলো এবং কেন, কিভাবে সবকিছু চেঞ্জ হইলো। জেল সম্পর্কে বই, মুভি ইত্যাদি থেকে আমরা যা জানতে পারি, পুরান জেলটা তার ধারে কাছেও ছিল না।

পুরান ঢাকারটা ছিল যেকোন ন্যারেটিভ- জেল সম্পর্কে যা আমরা শুনসি বা পড়সি, ঐটার থেকে অনেক খারাপ। কিন্তু ভিন্ন দিকে, আমাদের জেলের চিতা করলে কি মাথায় আসে? যে একটা অন্ধকার জায়গা, একটা ড্রেস পড়ায় রাখসে, একটা কোনায় বসায় রাখসে। এভাবেই তো মুভিতে দেখানো হয় আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লেখা যে বই-টই সেখানেও কাছাকাছি এরকমই দেখানো হয়। যদিনা ইউ রিড সাম অব দ্যা জার্নালস, যারা বড় বড় মানুষজন লিখসে। এন্ড দে ইউজুয়লি গেট ডিফরেন্ট ট্রিটমেন্টস। যেমন, বঙ্গবন্ধু- কারাগারের রোজনামচা, তিনি কিন্তু একটা ভিআইপি সেলেই থাকতেন। তাদেরকে আলাদা জায়গায় রাখা হতো। হুইচ ইজ নাথিং লাইক হাউ দ্য জেনারেল পিপল আর কেপ্ট। সো ঐখান থেকে একটা সার্টেইন পারসপেক্টিভ পাওয়া যায়; এক ধরনের মানুষের। বাট জেলের ভিতরেও কিন্তু সেগমেন্ট আছে। জেনারেল, তারপর যারা একটু ডেইনাজারাস ক্রিমিনালস, যারা ভিআইপি, যারা ক্লাস ওয়ান অফিসার অথবা পলিটিসিয়ান, যারা ফার্স্ট গ্রেডের ইন্ড্রাস্ট্রিয়ালিস্ট, সাংবাদিকদের আলাদা ভাবে রাখা হয়। যদি জামাত-শিবির এইসব রিলেটেড হয় তাহলে তাদেরকে ভিন্নভাবে রাখা হয়। ফাঁসির আসামিদের ভিন্ন জায়গায় রাখা হয়। বিকজ এদের বিভিন্ন ধরনের ইস্যুস আছে।

যাই হোক এখন আপনাকে আমি প্রথম দিন থেকেই গল্প বলে যাই। হোয়েন আই এন্টার্ড দ্যা কম্পাউন্ড, ফার্স্টে রেজিস্টার করা হয়। যারা নতুন এন্ট্রি আসলো, যাদেরকে কোর্ট থেকে সাজা দেওয়া হইসে, যাদেরকে কোর্ট থেকে পাঠানো হইসে, তাদেরকে তো রেজিস্টার করতে হবে। ইমিগ্রেশনের মতন আরকি। সো লাইন ধরে দাঁড়াইতে হয়, আস্তে আস্তে সবার নাম-টাম, কেস নাম্বার টাম্বার যা আছে সব ডকুমেন্ট করা হয়। হাজতিদের জন্য জাস্ট ডকুমেন্ট করা হয়। কয়েদিদেরকে টু সাম এক্সটেন্ট তারা কি কাজ করবে সেটার একটা ধারণা পাওয়ার জন্য তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড সবকিছু জিজ্ঞেস করা হয়। সো আফটার দ্যাট, দে লেট ইউ ইন। নো ম্যান্স ল্যান্ড- ইমিগ্রেশন সেন্টারে এইরকম জায়গা আছে না, ইমিগ্রেশন পার করে ঢুকতে হয়। তো ঢোকার পর প্রথমে

একটা জায়গায় দাঁড়াইতে হয়, যেইটার নাম হচ্ছে 'আমদানি'। নতুন আমদানি যারা আসছে, তাদের জন্য। সো আমদানিতে এক রাতের জন্য রাখা হয়। পরের দিন এদেরকে বিভিন্ন ওয়ার্ডে পাঠায় দেয়া হয়। যাদেরকে যেইখানে পাঠানোর কথা। র‍্যান্ডোমলি আসলে র‍্যান্ডোমলি না। সো আমদানিতে প্রথম খাওয়ানো হয় সন্ধ্যার দিকে। তার আগে পর্যন্ত কোর্টের এক্টিভিটি শেষ। এর আগে পর্যন্ত কোর্ট থেকে আসতেই থাকে।

প্রতিদিন প্রায় ৪-৫ শত লোক ঢোকে। প্রথমেই সন্ধ্যা-রাতের দিকে খাবার দেয়া হয় যেটা খুবই স্বাদহীন। এটা খেতেই মানুষজন কান্নাকাটি করা শুরু করে। পরে তাদেরকে বসানো হয় ৫ জন করে লাইনে করে একটা ঘরের মধ্যে। পরে একটা লোক আসলো। তো দেখলাম যে তাকে আরো কিছু মানুষ সেবা করতেসে, পিছন পিছন ঘুরতেসে। বোঝা যাচ্ছে যে, উনি একজন লিডার টাইপের মানুষ। খাওয়া দাওয়া শেষে সে সামনে আসলো। সামনে এসে একটা চেয়ার নিয়ে বসলো। বাকী সবাই মাটিতে বসে আছে। সেও কিন্তু আসামী, কয়েদি। সে খুব সুন্দর করে গল্প বলা শুরু করলো। এই জেলের কি অবস্থা, কতটুকু জায়গা আছে, কতজন মানুষ থাকে। সেই সময়ে ঐ জেলে প্রায় ১০, ০০০ মানুষ ছিলো। সে আরো কিছু তথ্য দিলো। জিজ্ঞেস করলো যে, আপনারা জানেন এইখানকার খাবার দাবার এর খরচ-টরচ এটা কারা দেয়। আপনারা মনে করেন যে সরকার দেয়। কিন্তু আসলে সরকার দেয় না। এইসব খরচ দেয় হলো রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি। তো তখন ঐ জেলের ক্যাপাসিটি ছিলো ২৫০০। রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি যে খরচটা দেয় তা ২৫০০ জনের জন্যই দেয়। তাহলে বাকী ৭৫০০ জন মানুষের কী হয়। [হি ব্যাসিকালি স্টার্টেড আস্কিং কোয়েশচনস]। চিন্তা করেন, ঐ ২৫০০ জনের খাবার ভাগ করে খাচ্ছে ১০, ০০০ জন মানুষ। তাহলে প্রত্যেকে কতটুকু খাবার পাবে চিন্তা করেন। তারপর সে আরো গভীরে যায়। একজন মানুষের সুস্থ থাকার জন্য কী কী লাগে? তার কথা মত, ৩ টা জিনিষ খুবই জরুরি। একটা হলো

খাওয়া, দ্বিতীয় ঘুম আর তৃতীয় হলো স্যানিটেশন, বাথরুম, গোসল। এই তিনটা যদি আপনার না থাকে, আপনার সুস্থ থাকাই সম্ভব না। তারপর একে একে সে ব্যাখ্যা করা শুরু করল যে এই তিনটা অবস্থা কি।

খাওয়া হিসেবে সকালবেলার নাস্তায় তখন দিত ১ টা রুটি আর একটু গুড়। রুটিটা শক্ত আর সত্যিকার অর্থে বালি দিয়ে বানানো। আটার সাথে বালি, ময়লা মিক্স হয়ে এমন অবস্থা হয় যে, ঐটা হাতে নিলে সাথে সাথে ভেঙে পড়ে যায়। শক্ত যতটুকু থাকত তার উপর বালির স্তর থাকত। অনেক ঝেড়ে ঝুড়ে সাইডগুলো ফেলে দিয়ে একটু পাওয়া যায়।

দুপুরে দেয়া হয় সবজি আর ডাল-ভাত। তখনকার নিয়ম ছিল যার যার ভাত তার নিতে হবে লাইনে দাঁড়ায়ে। আর খেতেই হবে। কেউ যদি খাওয়ার সময় না থাকে তবে তার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা আছে। তাকে খেতেই হবে। এটা আমি বলছি ২০১৬ সালের কথা। দেরি করলে আপনি তলানির পোড়া ভাত পাবেন। লাইন ধরেই সবজি, ডাল নিতে হবে। ডালটা হচ্ছে একেবারে ড্রেনের পানি। সবজিটা খাওয়ার ধারে কাছেও নাই। পোড়া থাকত, কোনো স্বাদ নাই। আর রাতে দিতো ভাত আর এক টুকরো মাছ। তারপর সেই লিডার জিজ্ঞেস করলো যে, আপনাদের মনে হয় এই খাবার খায়ে সুস্থ থাকা সম্ভব?

এরপর বলি ঘুমানোর অবস্থা। এতগুলা মানুষের ঘুমানোর জায়গা অবশ্যই নাই। সাধারণত জেনেভা কনভেশন অনুযায়ী, একটা মানুষের ৬ ফিট বাই ৬ ফিট মানে ৩৬ বর্গফিট এর একটা জায়গা দিতেই হবে। সেইটা অপরাধী হোক আর যেই হোক। আসলে তো ঐটার ধারেকাছেও নাই। ২৫০০ মানুষের জায়গায় ১০, মানুষ থাকতেসে। তো মানুষজন আসলে কোন জায়গাই পায় না। ২টা শোয়ানোর স্টাইল আছে। তাদের ইনভেন্টেড টেকনিক্স।

১) যেভাবে ইলিশ মাছ প্যাক করা হয় বরফের মধ্যে। ইলিশ মাছ তো চ্যাপ্টা, তো এইটা সাইড করে প্যাক করা হয়। একটার পিছে আরেকটা লেগে থাকে। আপনি উপুড় হতে পারবেন না, কাত হয়ে শুতে হবে। এটাকে বলে ইলিশ ফাইল।

২) আরেকটা হচ্ছে একজনের উপর আরেকজন। একজনের পা আরেকজনের মুখের কাছে। বেসিক্যালি কেঁচির মতন। যাতে করে একজনের জায়গায় দুইজনকে রাখা যায়। এইটাকে বলে কেঁচকি ফাইল।

দুইটাই মূলত এডোপ্টেড সিস্টেম, ইনহেরেন্ট না। কম জায়গায় বেশি মানুষ রাখতে হয় জন্যে। পুরা প্রশাসনই জানে, শোয়ানো হয় রাতের বেলা। তখন তারা দেখেও না দেখার ভান করে। কার সাথে আপনার শুতে হবে আপনি জানেনও না। একেকজন সারাদিন ময়লা, থুথুর মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ঐখানকার হাইজিন এর অবস্থা খুবই বাজে। একটু বৃষ্টি হলেই আক্ষরিক অর্থেই হাগা ভাসতে থাকে। সবাই হাঁটতেসে ঐসবের উপর দিয়েই। রাতে এসে শুয়ে পড়লো আপনার মুকের কাছে পা দিয়ে। এইটাই আসলে অবস্থা। ১টার মধ্যে আপনাকে জায়গা নিয়ে নিতে হবে। আপনি যদি জায়গা না নেন তাহলে সারারাত আপনাকে দাঁড়ায়ে থাকতে হবে। এমনকি আপনি যদি রাতে বাথরুমের জন্যও বের হন তাহলেও দুই সাইড থেকে চাপ দিয়ে ঐ জায়গা পূরণ হয়ে যাবে।

তারপর সে গেলো হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ জিনিষ পানিতে। জেলখানায় বিভিন্ন হাউস ছিলো বিভিন্ন বিল্ডিং এর সামনে। একটা এরিয়ায় একটা হাউস। আমিঃ যেই এরিয়াতে থাকতাম ঐটা হচ্ছে পদ্মা মণিহার। একদম পিছনের দিকে। ঐখানে একটা হাউস ছিলো, বেশ বড়োই। ১৫ ফিট বাই ১৫ ফিট। এটা সারারাত পানি ভরতো। আর এই হাউসের পানি সারাদিন ব্যবহার করা হতো। তো সকালবেলা কী হতো যে সবাই অপেক্ষা করতো যে গেট খুললেই সবাই দৌড় দিবে, গোসল করবে। ২০০০ মানুষের জন্য ঐরকম ১টা হাউস। ২০০০

এর বেশি আসলে। যখন মানুষজন শুধু হাতও দিচ্ছে সাথে সাথে পানি শেষ। ২ মিনিটও লাগে না। মূলত মানুষজন গোসল করতো এমনভাবে যে, একজন গায়ে পানি ঢালতেসে আর একজন নিচে বসে ঐ পানি দিয়ে কোনোরকম পানি লাগাচ্ছে, যেহেতু সারাদিন আর পানি নাই। বাথরুমে যাবেন পানি নাই, খাবার পানিও নাই।

তারপর সে বলতো এর মধ্যে ভালো থাকবেন কেমনে? এইটা মূলত একটা সেলস-স্পীচ ছিলো। তারপর সে বলতো, আপনার প্রশ্ন করতে পারেন, আমার চামড়া এত চকচকে কেন? আমার স্বাস্থ্য এত ভালো কেন? তার একটা খান্দানি গোঁফও ছিলো। চামড়া আসলেই চকচক করতেসিল, জামাকাপড় পরিষ্কার। আমি এর মধ্যে ভালো আছি কেমনে? কারণ সিস্টেম আছে। আপনাদের জন্য অনেকগুলা প্যাকেজ আছে। একেকটাতে আপনাদের জন্য একেকরকম সুবিধা দেয়া হবে। সবচেয়ে ছোট প্যাকেজ হচ্ছে সপ্তাহে ৩৫০০ টাকা। ৩৫০০ টাকা দিলে সকালে পরাটা পাবে, সাথে ডিম, ডাল। এইগুলা খালি বলেই, আসলে কিছুই নাই। দুপুরে সবজি, ডিম দেয়া হবে। রাতেরবেলা একদিন মুরগী, একদিন মাছ দিবে। আপনাকে ঘুমানোর জন্য ১ হাত পরিমাণ জায়গা দেয়া হবে। আর আলাদা করে ১ বালতি পানি আর ৫ লিটারের ২টা গ্যালন। ১টা বাথরুমের জন্য আর ১টা খাওয়ার জন্য। আর গোসলের জন্য ২০ লিটারের বালতি। এটা হচ্ছে মিনিমাম প্যাকেজ। এরপর আপনি চাইলে সিট-ঘুমানোর জায়গা কিনে নিতে পারেন। ঐটার জন্য সপ্তাহে আপনার ৬-৬৫০০ টাকা লাগে। এটা আপনার পারসোনাল।

এরপরে আসেন মেডিকেল। এখানে খাবেরে সাথে দুধও দেয়া হয়। এখানে যদি আপনি সিট চান, অসুস্থ না হলেও তবে আপনার খরচ হবে ২৫, ০০০টাকা। বিছানার পাশাপাশি আপনি ভালো খাবারও পাচ্ছেন। এইরকম বিভিন্ন সেলের বিভিন্ন রেট।

কারাবন্দীর অভিজ্ঞতা- ২

গবেষক: আপনার কারাবন্দী হওয়ার অভিজ্ঞতা জানান।

নাজিফা (ছদ্মনাম): পুলিশ আমার ও আমার অন্যান্য বন্ধুদের বিরুদ্ধে ১০টি ধারায় মামলা করেছে। এসব ধারার মধ্যে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির ক্ষতিসহ হত্যার চেষ্টাসহ মোট ১০টি ধারায় মামলা হয়েছে, আমরা কিছুই করিনি। আমরা সেদিন মিছিল করছিলাম। পুলিশ সেদিন শুরু থেকেই খুব আগ্রাসী ছিল। তাই মিছিল থেকে আমাদের আটক করে। সেখান থেকে প্রথমে শাহবাগ থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। প্রায় দুপুর ২টা পর্যন্ত আমরা সেখানে ছিলাম। সেখান থেকে আমাদের ধানমন্ডি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। আমাদের মধ্যে ৫জন ছেলেকে একটি সেলে রাখা হয়েছিল এবং আমাদের একটি অফিসের মতো জায়গায় রাখা হয়েছিল যেখানে মহিলা পুলিশ অফিসাররা বসেছিলেন। পরদিন দুপুর ২টায় আমাদের পুরান ঢাকার আদালতে শুনানির জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর ছেলেদের হাতকড়া পরানো হয়। আমাদের মেয়েরা এটা পরেনি। পুলিশ আমাদের বিরুদ্ধে রিমান্ড চায়। কিন্তু আদালত রিমান্ড বাতিল করে আমাদের কারাগারে পাঠায়। এরপর আমাদের কাশিমপুর এবং ছেলেদের কেরানীগঞ্জে পাঠানো হয়। আমরা যখন রওনা হলাম তখন প্রায় 9টা বাজে। মানে সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে কারাগারে ঢোকার নয়টা বেজে গেছে।

গবেষক: আপনাকে যখন কারাগারে প্রথমবার নেওয়া হলো সেসময়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে কিছু যদি জানান।

নাজিফা (ছদ্মনাম): ভিতরের দিক থেকে, এখানে যারা কাজ করে তাদের আচরণ খুবই খারাপ। আমরা চলে যাওয়ার পর ওরা খুব খারাপ আচরণ করেছে। প্রথমত, আমার হাতে দুটি চুড়ি ছিল। সেই চুড়িগুলো আমার খুব পছন্দ ছিল। এখানে নিয়ম হলো শুরুতেই সবকিছু চেক করা। মানে কাপড় খুলে চেক করা। জেলে ঢোকার আগে একটু জায়গা আছে। সেখানে চেকিং এবং ভেতরে তাদের অফিসের মতো। তাই তারা চেক করেছে। নিয়ম

হলো সোনা বা রৌপ্য থাকলে, তাদের খিলান আছে, সেগুলো সেখানে সংরক্ষণ করা হয়। আমি বললাম আমার চুড়িগুলো খুব প্রিয়, ফেলে দিও না, কোথাও রেখে দাও। তাই তারা এটি মোটেও শোনেনি। পাশেই একটা ডাস্টবিন ছিল, সেখানেই ছুরিটা ছুড়ে দিল। তাই আর কিছু বলতে পারলাম না। যাইহোক ভালো হয়েছে. তাই আমার সাথে আমার এক বন্ধু ছিল। সে সময় তার মাসিক চলছিল। তাই তার কোনো প্যাড ছিল না। তাই ততক্ষণে একদিনেরও বেশি পার হয়ে গেছে। প্রায় একদিন তিনি কোনো প্যাড পরিবর্তন করতে পারেননি। যে ব্যক্তি নামটি প্রবেশ করেছে তাকে আমরা শুধু বলি, এবং আমরা নিশ্চিত যে কোনো টিস্যু পেপার সাজানো যাবে কিনা। তখন তারা বলল, আমরা কি আপনাকে দাওয়াত দেব? তাই এগুলো ব্যবহার করে আমরা চুপ হয়ে যাই। তারা এত গালাগালি করছে যে আপনি চুপ হয়ে যান। বাইরের দুনিয়ায় এসব গালি শুনিনি। এরপর আমাদের একটি সেলে নিয়ে যাওয়া হয়। যেখানে আমরা 22 জন ছিলাম। তাই আমরা মেঝেতে চাপা থাকলাম। ঘরে একটা বাথরুম আছে। বাথরুমের দরজা অর্ধেক খিলানযুক্ত। বাথরুমের সামনেও মানুষ ঘুমাচ্ছে। বাথরুমে যেতে হলে তাদের পায়ের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে। সবচেয়ে খারাপ জিনিস ছিল বাইরের বিশ্বের সাথে যোগাযোগ করতে না পারা। কোনো হদিস জানা যায়নি। সেখানে যাওয়ার পর থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছিল। প্রতিটি ওয়ার্ডে একজন লেখক আছে। লেখক তিনিই এন্ট্রি করেন। আমাদের রুমের বাইরে একজন গার্ড আছে। তখন শীতকাল। তিনি আমাদের দুটি কালো কম্বল দিয়েছিলেন আমাদের শরীরের উপর এবং নীচে রাখার জন্য। আবার লক্ষ্য করলাম আমাদের সাথে অন্য বন্দীদের আচরণ একটু আলাদা। আমাদের প্রথমে বাথরুমের সামনে থাকতে বলা হয়েছিল। তাই আমি শুরুতে নিরাপদ পাশে দাঁড়িয়েছিলাম এবং নড়াচড়া করিনি। রাতে ঘুমাতে পারিনি। অনেক মশা ছিল। মাঝরাতে ঘুম ভাঙল। তাই লেখক ধমক দিতে শুরু করেন কেন আপনি জেগে উঠলেন। সকালে ঘুম পাচ্ছে। তখন সেখানকার এক মহিলা আমার সম্পর্কে খুব খারাপ ভাষায় অভিযোগ করতে লাগলেন যে আমি

কেন ঘুমাচ্ছি। তাই এই প্রথম দিনটা খুব খারাপ। তবে প্রতিদিন যে খারাপ হয় তা নয়। পরে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বোঝার চেষ্টা করলাম। কোথাও কি কোন তথ্য পাওয়া যায়? জেলের পরিবেশ খারাপ নয়, সুন্দর। এখানে একটি হাসপাতাল, একটি বিউটি পার্লার, একটি হস্তশিল্প শেখার সুবিধা, শিশুদের জন্য একটি ডে কেয়ার, একটি লাইব্রেরি রয়েছে। সময় কাটানোর জন্য লাইব্রেরিতে গেলাম। আপনি সপ্তাহে 1 দিন বাড়িতে কথা বলতে পারেন. কিন্তু অনেক লম্বা লাইন। ৪ মিনিটের জন্য কথা বলতে পারেন।

কারাবন্দীর অভিজ্ঞতা- ৩

মগবাজার রেল গেইটের পাশে একটি পিঠার দোকানে দেখা হয় মো. সুমন মিয়ার (ছদ্মনাম) সাথে। সুমনের বয়স ২৩ বছর। বাবা ও মায়ের সাথে মিলে পিঠা বিক্রির এই দোকানটি চালান তিনি। সুমনের বড় ভাই আবদুস সালাম জন্ম থেকেই বোবা। ছোট একজন বোন আছেন, আমিনা আক্তার, তার বয়স ১৩ বছর। সুমনের জন্ম ও বেড়ে ওঠা মগবাজার এলাকাতেই। রেলগেইটের পাশে একটি ভাড়া বাড়িতে দাদা-দাদী ও বাবা-মায়ের সাথে বাস করছে পরিবারটি। পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা ৭ জন। পুরো পরিবারটি দৈনিক পিঠা বিক্রি করে আয় করে পাঁচ-সাতশ' টাকা। কথা প্রসঙ্গে সুমন জানায় যে, একসময় একারই আয় ছিল দিনে পাঁচশ' টাকার বেশি। এই কথার জের ধরে জানতে পারি যে, সুমন মাদক বিক্রির সাথে জড়িত ছিল। মাদক মামলায় গত ২০২০ সালের এপ্রিলে জেলে যেতে হয় তাকে। তার দোকানে পিঠা খেতে খেতে, মাদক বিক্রির সাথে জড়িত হওয়া ও জেলের অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা হয় তার সাথে।

জেলে কতদিন ছিলেন?

- দুই মাস ১০ দিন ছিলাম।

সেইবারই কি প্রথম জেলে যাওয়া?

- হ্যাঁ।

কি মামলা হয়েছিল আপনার নামে?

- মাদকের মামলা দিয়েছিল। ঐ লাইনেই ছিলাম। আমার সাথের অনেকেই এখনো ঐ ব্যবসাই করে।

তাদের সাথে কিভাবে আপনার পরিচয় হয়েছিল?

- কারা? আমার বন্ধুদের কথা বলছেন? ওরা আমাগোর এলাকারই। দেখতাম ওরা কারওয়ান বাজার থাইকা মালপাতি আনতো, আইনা বিক্রি করত। অনেক টাকা পয়সা। এইগুলা অবৈধ ব্যবসায় অনেক টাকা, কাঁচা টাকা। পরে ওদরে সাথে চলতেই এই লাইনে ঢুইকা গেলাম।

কারওয়ান বাজার থেকে কিভাবে মাদক আনতেন?

- আমাদের বুবু আছেন একজন। যারা এইসব খায়, তারা সবাই কমবেশি এক নামে চিনে। বুবু আমাগোরে ডেইলি ১৫/২০টা কইরা পুটলা দিত, বেচনের লাইগা। আমরা ঐগুলা আইনা এলাকার দিকে, বা মনে করেন, আশে পাশের দিকে খুচরা বেচতাম। বেইচা দিলে পরে বুবু কমিশন দেয়, এমনেই চলে।

কত টাকা কমিশন পায় একেকজন?

- ডেইলি পাঁচশ' কইরা দেয়। এইডা ফিক্স। কখনো বিক্রি ভালো হইলে সাড়ে পাঁচশ', ছয়শ' টাকা দিত। আর অহন বাপে-পুতে মিলা ডেইলি পাঁচশ' টাকা হাজিরা তুলতে কষ্ট হইয়া যায়।

অন্য কোন ব্যবসা করার চেষ্টা করেন নাই? মানে অন্য কোন পেশা?

- অন্য কোনভাবে টাকা-পয়সা ইনকামের সিস্টেম নাই। ওইটা আমি আমার র্কম হিসেবেই করতাম।

পরে জেলে গেলেন কিভাবে?

- ধরা খাইয়া গেছি। এফডিসির ঐ দিকটা থাইকা পুলিশ ধরছিল। পরে কোর্টে চালান কইরা দিছে। পরে তো জেলে দিয়া দিল।

জেলে থাকার সময়ের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?

- ভাই, ঐটাতো হইল বন্দীজীবন। যদি বাবা মার সাথে না থাকতে পারি, তাইলে দুনিয়ায় না থাকাই ভালো। ওইখানে আমি কি খাই, কি পরি, কিভাবে থাকতাছি ওইটা তো আর ওরা জানতেছে না, দেখে না। এক কথায় অসহায় জীবন।

যখন জেলে ছিলেন, আপনার পরিবারের কি অবস্থা হয়েছিল?

- পরিবারে দৌড়াদৌড়ি করছে। ওইটা তো আমি আর ভিতরে থাইকা দেখি নাই। তারা দৌড়াদৌড়ি করছে, অনেক দূর-দূর গেছে। কোটকাচারিতে দৌড়াইছে। তাদের প্যারা হইছে অনেক এইডা নিয়া।

জেলে থাকাকালীন কোন ভালো অভিজ্ঞতার কথা যদি বলেন,

- ভালো অভিজ্ঞতা আবার কি! ওইখানে যায়ে নিজের কাজ নিজে করছিলাম। যখন ওয়ার্ডের রাইটার হইছিলাম, তখন আরামে ছিলাম কিছুটা। এই এতোটুকুই। মানুষের খাবার দাবার আইনা দিছি। যে যা সিগারেট-বিড়ি পারছে দিসে। ভালোবাসছে তাই দিছে – এইরকম। বাপ-মায়ের উপ্রে তখন প্রেশারটা কম পড়ছে। এইটাই।

আর সবচেয়ে খারাপ অভিজ্ঞতা কি ছিল?

- খারাপ অভিজ্ঞতা – এইটা যার যার মনের ধারণা। আমি যদি চাই যে খারাপ হয়ে যেতে, তাইলে খারাপ হয়ে যাব। ওই জায়গাটাই হলো খারাপ। জেইল বলতেই খারাপ, আবার জেইল বলতে শিখার অনেক কিছু আছে। ভিতরে ঢুকার টাইমহৈ লেখা আছে 'রাখিব নিরাপদ দেখাব আলোর পথ'।

জেল থেকে ফিরে আসার পর কেমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন?

- ফিরে আসার পর আর কি, বাপ-মায়ের লগে পিঠার দোকান করতাছি। কিন্তু অনেক ঝাঁকে ঝাঁকে বাধা আসতেছে। কারণ মাদক বিক্রি করছি।

কেমন বাঁধা?

- অনেকেই বলেছ তুই ভালো হবি না, এইনা, সেই না। মানুষ তো বলবেই। আমি অকারেন্স করছি, জানি, সত্য। এই কারণে আমাকে জেলে শাস্তি দিছে। আমি মাথা পাইত্যা নিছি। কিন্তু মানুষের মুখ কি আর বন্ধ করা যায়!

কারাবন্দীর অভিজ্ঞতা- ৪

গত ২২ অক্টোবর ২০২২ তারিখে রাতে রিক্সায় করে বাসায় ফেরার পথে কথা হয় আনুমানিক ২৫ বছর বয়সী রিক্সার চালক আবদুল মুনাফের (ছদ্মনাম) সাথে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মোড় থেকে আমার বাসায় আসতে সচরাচর ১০০-১২০ টাকা রিক্সা ভাড়া দিতে হয়। কিন্তু আবদুল মুনাফ ৮০ টাকাতেই রাজি হয়ে গেলে, আমার ধারণা হয় যে, তিনি সম্ভবত একজন নতুন রিক্সাচালক। সেই কথার জের ধরে কথা হয় তার সাথে। আবদুল মুনাফের বাড়ি নড়াইলের গোবড়া উপজেলায়। তিনি বর্তমানে ঢাকার কামরাঙ্গীর চরে থাকছেন, এবং রাতের বেলায় ব্যাটারী চালিত রিক্সা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছেন। তিনি ঢাকায় এসেছেন সেপ্টেম্বর মাসের শুরুর দিকে। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, জেল থেকে বের হওয়ার পর তার নিজের এলাকাতে কর্মসংস্থান তৈরিতে হিমসিম খাচ্ছিলেন। তাই বাধ্য হয়ে ঢাকায় এসেছেন। তার সাথে তখন জেলে যাওয়ার বিষয়ে কথা হয়;

আপনি কোন জেলে ছিলেন?

- আমাদের নড়াইলেই।

কতদিন ছিলেন?

- চার মাস ছয় দিন ছিলাম।

জেলে যাওয়ার কারণ?

- মারামারি কইরেছিলাম। এলাকার মেম্বারের সাথে। পরে এইটা সেইটা বানায়ে আমারে জেলে ঢুকায়ে দিছে।

ঘটনা কি ঘটেছিল? মারামারি হওয়ার কারণ কি ছিল?

- আর কয়েন না, আমার ছোট ভাই মোরশেদ আমাদের ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম পুলিশের চাকরী করে। আমাদের চেয়ারম্যান সাহেবই চাকরীটার ব্যবস্থা কইরে দিছে। এদিকে চেয়ারম্যান সাহেবের সাথে আবার নিয়াজী মেম্বারের সাথে ঝামেলা। এর মাঝে পরিষদের ক্যাশ থাইকে টাকা নাকি চুরি হইছে। দোষ গিয়া পড়ছে আমার ভাইয়ের উপরে। বুঝেন না, সব ঐ মেম্বারের চাল। চেয়ারম্যানের সাথে ঝামেলা করার জন্যই এইসব করছে। পরে তো শালিস বসাইছে পরিষদে। শালিসেই এই কথা সেই কথার মাঝে নিয়াজী মেম্বার বইলা বসলো যে, পরিষদের সব টাকা হাতানোর জন্য নাকি মোরশেদরে চাকরী দিছে চেয়ারম্যান সাহেব। বাপ-মা তুইলে গালাগালি শুরু করে। তখন মাথা ঠিক রাখতে না পাইরে মারতে গেলাম।

আপনি এলাকায় কি কাজ করতেন?

- আমি ওয়ালটনের একটা শোরুমে কাজ করতাম তখন।

পরে তাহলে, এই বিষয় নিয়েই জেলে গেলেন? জেলে কেমন অভিজ্ঞতা ছিল?

- ভালো না ভাই। জেলের ভিতরটা অনেক কষ্টের। পরিবারের অবস্থাও খারাপ হয়ে গেছিলো। পরিষদের টাকা চুরির বিষয়টা পরে চেয়ারম্যান সাহেব সমাধা করছিলেন। কিন্তু, একার ইনকামে সংসার চালাইতে গিয়া আমার ভাইডির অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। আমার ভাইডি চার মাসে একটা বারের জন্যও আমার সাথে দেখা করতে আসে নাই। যার জন্য মারামারি করলাম, সেই কোন খোঁজ নিল না।

জেলে আপনার পরিবারের কেউ দেখা করতে আসে নাই?

- আম্মা আসতো কয়েকদিন পরপরই। আব্বায় লগে কইরে নিয়া আসতো।

আপনাকে দেখা করতে দিত?

- হ্যাঁ। আধা ঘন্টার মতো দেখা করতে দিত।

এমনিতে জেলের খাবার-দাবার কেমন ছিল?

- খুব বেশি খারাপ না।

খুব বেশি খারাপ না বলতে?

- এই জীবন বাঁচানোর জন্য কোনমতে খাওয়া যায় এইরকম!

আচ্ছা, জেলের কি কোন ভালো দিক আপনার চোখে পড়ছে?

- ভালো বলতে, ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়া হইত তখন। আল্লার রহমতে নামাজটা আর ছাড়ি নাই।

আর খারাপ দিক?

- খারাপ যদি বলেন, সেইটে হলো থাকার জায়গা। ঐটা কোন মানুষের থাকার জায়গা না। এক জায়গাতেই হাগামুতা, ঐ জায়গাতেই ঘুম। খুব কষ্টের।

আপনি জামিন পেলেন কি করে?

- চেয়ারম্যান সাহেব জামিন করাইছেন।

এলাকা ছেড়ে আসলেন কেন?

- জেল খাইটে আসার পরে, লোকজন বাজে কথা কয় আড়ালে। আর নিয়াজী মেম্বার আবারো ঝামেলা করতে চায়। চাকরীটা তো গেছে। আর কোন চাকরীও জোগাড় করতে পারি নাই। আর কি করব, বাধ্য হয়া রিক্সা চালাই।

কারাবন্দীর অভিজ্ঞতা- ৫

ঢাকার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ইরা (ছদ্মনাম), বয়স আনুমানিক ২৪। ২০২২ সালের জুলাই মাসে শাহবাগ মোড়ে বামপন্থী রাজনৈতিক দলের মশাল মিছিল থেকে গ্রেফতার করা হয় তাকে। পরবর্তীতে কাশিমপুরের কেন্দ্রীয় কারাগারে ১১ দিনের হাজতবাসে পাঠানো হয় তাকে। এই প্রসঙ্গে কথা হয় তার সাথে;

জেল পরবর্তী জীবনের অভিজ্ঞতা কেমন? কেমন পার্থক্য অনুভব করছেন?

- আগের মতোই। তবে বাড়ি থেকে এখন রাজনৈতিক কাজে নিরুৎসাহিত করা হয়। তারা চান না, আমি আর রাজনীতিতে যুক্ত থাকি। তবে, আমি দমে যাই নি। আমি আগের মতো করেই কাজ করে যাচ্ছি।

জেলে মোট কতদিন ছিলেন?

- ১১ দিন ছিলাম। যদিও, আমাদের জামিন হয়েছিল একদিন আগেই। জেলে জামিনের কাগজ এসে পৌঁছাতে দেরি হওয়ায় একদিন বেশি আটকে রেখেছিল।

জেলের পরিবেশ কেমন?

- সেনিটাইজেশনের অবস্থা খুবই বাজে। অস্বাস্থ্যকর আর নোংরা।

জেলে অন্য কয়েদিদের থেকে কেমন ব্যবহার পেয়েছিলেন?

- জেলে অনেক নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে। নতুন মানুষদের সাথে পরিচিত হয়েছলিাম। আমাদের ৭ জনকে আটক করা হয়েছিল। আমার ২ জন ছিলাম মেয়ে। আমাদের রাজনৈতিক পরিচয় পাওয়ার পর অন্যান্য কয়েদিরা আমাদের সাথে ভালো ব্যবহার করেছিলো। আমার মনে হয়েছে, রাজনৈতিক প্রচারণার জন্য বাংলাদেশের জেলগুলো বেশ ভালো জায়গা।

জেলের ভিতরে কোন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড চোখে পড়েছে?

- আমি ১১ দিন ছিলাম মাত্র। আর আমাদের একটা রুমের মধ্যেই আটকে রেখেছিল। ঐরকম কোন সংগঠন বা দল, এইসব চোখে পড়ে নাই। তবে, থাকলে খারাপ হতো না। ভিতরে খুব বোরিং লাগে। তবে, অনেক কয়েদিদের সাথে আলাপ হয়েছে, তারাও কথা বলতে, তাদের গল্প শুনাতে অনেক আগ্রহী।

কারাবন্দীর অভিজ্ঞতা- ৬

২০২২ সালের জুলাইয়ে ইরা'র (ছদ্মনাম) সাথে একই মিছিল থেকে আটক হয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র খলিল জামান (২৩)-ও (ছদ্মনাম)। গ্রেফতারের পর কেরাণীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয় তাকে। সেখানে ১০ দিন হাজতবাস শেষে জামিন পান তিনি। জেলে থাকাকালে পরিবারের অবস্থা কেমন হয়েছিল জানতে চাইলে তিনি বলেন,

- পরিবারের অবস্থা চলছিলো। আমার ফ্যামিলিতে এটা অনেক কমন একটা ব্যপার, কেউ কোনো প্যারা নেয়নি।

আপনার এর আগে জেলে যাওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল?

- শাহবাগ থানায় পুলিশ হেফাজতে ছিলাম একদিন। করোনার আগে। জেলে এই প্রথম।

জেলের পরিবেশ কেমন দেখলেন?

- জেলে থাকার অভিজ্ঞতা, খাওয়ার অভিজ্ঞতা সবকিছু হলের চেয়ে অনেক ভালো। জেলের কোনো খারাপ অভিজ্ঞতা নেই। বলতে পারেন আমাদের হলোগুলোর চেয়ে অনেক ভালো।

থাকার জায়গা, খাবার এইসব কেমন?

- সত্যি কথা বলতে কি, হলে যেই রকম জীবন যাপনে অভ্যস্ত, সেই হিসেবে জেলের ভিতরটা অনেক পরিপাটি। হয়ত নতুন বলে এই রকম অবস্থা।

জেলের ভিতরে কোন প্রকার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নজরে এসেছে আপনার?

- ঐখানে মননচর্চা কেন্দ্র আর কাকতাল নামে দুইটা সংগঠন আছে। ওরা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড করে থাকে। আমার পরের দিনই তাদের সাথে আলাপ হয়। আমার বেশ ভালোই লেগেছে। বলতে পারেন, একটা ট্যুরের মতো ছিল আরকি!

জেল থেকে ফেরত আসার পর সমাজের অন্যদের থেকে কেমন ব্যবহার পাচ্ছেন?

- খুব একটা যে পরিবর্তন হয়েছে এমন না। তবে ডিপার্টমেন্টের টিচাররা প্রায়ই বলে, 'একটু পড়াশুনাও করিও।' সবাই মনে করে যে আমি কেবল রাজনীতি করি, পড়াশুনা করি না।

কারাবন্দীর অভিজ্ঞতা- ৭

ঢাকার পাটুয়াটুলিতে একটি ইলেক্ট্রনিক্সের যন্ত্রপাতি সারানোর দোকান চালান নুরুল ইসলাম (বয়স আনুমানিক ২০, ছদ্মনাম)। পরিবারের সাথে বর্তমানে কোন যোগাযোগ নেই তার। বাবা, সৎ মা, আর ৩ ভাই ১ বোনের পরিবার ছিল তার। ছিনতাইয়ের মামলায় ৩ মাসের সাজা হয়েছিল। পাটুয়াটুলিতে আমার পরিচিত একজনের মাধ্যমে যোগাযোগ হয় নুরুল ইসলামের সাথে। জেলে থাকার অভিজ্ঞতা কেমন ছিল জানতে চাইলে তিনি জানান যে,

- যখন জেলে ছিলাম সবাইকে মিস করতাম, কিছুই ভালো লাগতো না।

জেলে মনে রাখার মতো ভালো অভিজ্ঞতা কি ছিল?

- জেলের মধ্যে আমার শফিকের সাথে পরিচয় হইছিলো। শফিক এখন আমার বন্ধু। আমরা এখন প্রতি শুক্রবার আসরের পর দেখা করি। শফিক খুন করে নাই, তবু ও জেলে ছিলো।

আর সবচেয়ে খারাপ অভিজ্ঞতা?

- আমি ছিনতাই করছলিাম তবু আমার জামিন আগে আগে হইছলো, কিন্তু শফিকের জামিন হইছিলো অনেক পর। ওরে জেলে রাখে আসতে আমার ভালো লাগে নাই।

জেলে গান-বাজনা ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল?

- ভিতরে যার যেইটা মন চায় গায়। এমনে হারমোনিয়াম ঢোল দিয়ে গান গাওয়ার কোন সিস্টেম ছিল না। একজন ছিল সাইদুল নামের ভালো গান গাইতে পারতো।

জেলে থাকা অবস্থায় পরিবারের লোকজনদের আপনার সাথে দেখা করতে দিয়েছিল?

- তারা কেউ আসেই নাই। পরিবারের খোঁজ জানি না। ওরা আমাকে ত্যাজ্য করছে, আমিও ওদের ত্যাজ্য করছি।

জেল থেকে ফেরত আসার পরে কি করেছিলেন?

- জেল থেকে বের হয়ে আগের দোকানে আবার গেছলিাম, ওরা আর কাজ দেয় নাই। প্রথমে অনকে কষ্ট হইছে। এরপর শফিকের বাপের সাথে দেখা করে, টাকা ধার নিয়ে যন্ত্র কিনে কাজ শুরু করছি। এখন এলাকার সব বাড়ির কারেন্টের কাজ আমিই করি।

এলাকার মানুষজন কেমন ব্যবহার করেন?

- দুনিয়ায় কেউ কারো না। মানুষ আমাকে কীভাবে দেখে জানি না। মানুষের খাই না, মানুষের পরি না; যার যেই ভাবে ইচ্ছা দেখুক।

কারাবন্দীর অভিজ্ঞতা- ৮

রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের কারাবন্দী ফোরকান (ছদ্মনাম) বলেন, জেলখানায় বিভিন্ন পরিবারের বিভিন্ন বৈশিষ্টের লোকজন জেলখানায় থাকে। তাই মারামারি হয়, ঝগড়া হয় আবার মীমাংসা হয়। কোন অঘটন ঘটলে জেলের কেস টেবিলে বিচার করে জেল কতৃপক্ষ এবং শাস্তি বিধান করে। শাস্তি সরূপ শারীরিক আঘাত,

ভর্তসনাসহ অনেক ধরনের শাস্তি প্রদান করা হয়। তবে জেলখানায়যেমন আইন আছে তেমনি আইনের ফাঁকও আছে -অর্থাৎ বিনিময় মাধ্যম চলমান। এখানে একটা অর্থনৈতিক চক্র সবসময় কাজ করে। অর্থ দিলে এখানে অসম্ভব সম্ভব হয়ে যায়। টাকা দিলে নেশখোরের নেশাও যোগার হয়। এখন কি অবস্থা জানি না। একটা মজার বিষয় হচ্ছে, এরকম কিছু সন্তান বাসায় নেশা করতো তখন তো বাপ মা তাকে দেখতে পারেনাএবং বাধ্য হয়ে তাকে জেলে পাঠানো হয়েছে। এক ছেলে সাতদিন কোন নেশা করেনি, তখন ঐ ছেলে বিভিন্নভাবে মাধ্যমে কন্টাক্ট করে বাসায়, বলে যে আমাকে একটু ব্যবস্থা করে দে নাইলে কিন্তু আমি মরে যাব। যখন সে তার মাকে এ ধরনের কথা বলে তখন মায়ের মনে একটা ভয় ভীতি সৃষ্টি হয় এবং সে বলে যে অন্তত আমার ছেলে নেশা করলে করুক তবু আমার ছেলে বেঁচে থাক। মরে গেলে তার ছেলে কোথায় পাবে। এসব চিন্তা করে এইসব দুর্বলতা জায়গা থেকে তখন মা এই কাজগুলো করে, মানে বিভিন্ন মাধ্যমে নেশার ব্যবস্থা করে দেয়। অনেক আসামিআছে যারা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে নেশাদ্রব্য নিয়ে যায় এবং এই আসামীকে আবার অন্য আসামিরা পুলিশের হাতে ধরায় দেয়।

কারাবন্দীর অভিজ্ঞতা- ৯

শ্রী অনীল চন্দ্র রায় (ছদ্মনাম), বর্তমান বয়স ৭০ বছর এবং পেশায় একজন কৃষক। শ্রী মতি শশী রানী (ছদ্মনাম) একজন গৃহিণী। বয়স ৫০। অনীল ও শশী সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী। তারা নিজ সন্তান খুনের মামলায় পঞ্চগড় জেলা কারাগারে ৪ মাস কারাবাস করেন। পরবর্তীতে সেই মামলা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। কারাগারে থাকাকালীন অভিজ্ঞতা পঞ্চগড় জেলার আঞ্চলিক ভাষায় সংলাপ আকারে উপস্থাপন করা হলো-

পর্যবেক্ষক: কাকা তোমার মামলাটা কি শেষ হয়া গেইসে?

অনীল: কোন খান মামলা?

পর্যবেক্ষক: ওই যে মার্ডার কেসের মামলা খান।

অনীল: আহ! ওই মামলা কবেইশেষ।

পর্যবেক্ষক: এতো তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেইল।

অনীল: না হয়া যাবে কোঠে। হামেরা কি খুন কইচ্ছি নাকি।

পর্যবেক্ষক: কেনে কাকা?

অনীল: কেনে আবার? হামেরা খুনে করি নাই। মামলা মিথ্যা প্রমান হইছে।

পর্যবেক্ষক: কাকা, আসলে তোমার ঘটনা কি হইসিল কনেক খুলি কওতো আইজ। কাথায় কাথায় উঠি আসিল যেহেতু।

অনীল: দুঃখের কাথা কি শুনিবোরে বাপই? মানষিতো বিশ্বাস করেনা এলাও যে মুই খুন কর নাই।

পর্যবেক্ষক: মানষি বিশ্বাস করুক বা নারুকমামলাতো মিথ্যা প্রমানিত হইসে বারে।

অনীল: মানষি এলাও জানে মুইয়ে মোর ব্যাটাক খুন কইচ্ছু।

পর্যবেক্ষক: আচ্ছা কাকা, ঘটনাটা কি হইছিল খুলি কও কনেক?

শশী রানী: ওইলা মেলা হিস্ট্রি বাপই। কবার গেলে দিন আইত নাইও।

অনীল: এতো কাথা শুনিবার তোর ধইর্য্য হবার নয়।

পর্যবেক্ষক: না কাকা, কহেন তোমরা।

অনীল: মানষি আইজ জানে, মুই মোর নিজের ব্যাটাক খুন কইচ্ছু। ধর্মস্ত কাথা ব্যাটা মুই খুনটা করো নাই।

পর্যবেক্ষক: তাহলে কায় কইচ্ছে?

শশী রানী: বাপই কাহকো কইন্না। কলেও আর ঝামেলা হবার নয় মেল্লা দিনের কাথা। খুনটা মোর বড় ব্যাটা কইচ্ছে।

পর্যবেক্ষক: বড় ব্যাটা কায় বারে।

শশী রানী: আরে মোর সতীনের ব্যাটাটা। মুইতো সৎ মাও। মানষি মোকে দোষারোপ কইচ্ছিলো। মোরে বুদ্ধিত বলে ওর বাপ খুন কইচ্ছে। কত বাপই, মানষি যদি বাড়িত একটা কুকুর পুষে কুকুরটার প্রতিওতো মানষির একটা মায়া থাকে। আর মুই মোর সতীনের দুইটা ব্যাটাক তিন বছর চার বছর বয়স থাকি ওমাক মুই মানষি কইচ্ছু। ওর মাও তো ওমাক থুয়া চলি গেইসে। মুই কিন্তু উমাক ফেলে দেও নাই। মোর নিজের ব্যাটা ব্যাটি স্বপন, শেফালীক যেমন করি মানুষ কইচ্ছু ওমাকো ওইমন করি মানুষ কইচ্ছু। মুই কেমন করি একটা ব্যাটাক খুন করিবার পার ক? মুইতো ওমার মাও। কিন্তুক আইজ মুই সৎ মাও বলি, মুইয়ে বলে খুন কইচ্ছু।

পর্যবেক্ষক: খুনটা কেমন করি হইল?

শশী রানী: তোর কাকার মুখতে শুন আগত।

অনীল: মোর বড় ব্যাটা নিত্যানন্দ। ওর বয়স জ্যালা ১৭ হইল মোক না জানেয়া চুপ করি একখান বিয়াও করিলেক। এতকাল মানুষ করিনু আর মোক না জানেয়া ওয় বিয়াও করিলেক। খুব কষ্ট পাইছিনু বাপই। মোর বড় ব্যাটা কত আশা ছিল ধুমধাম করি ওক মুই বিয়াও দিম। ওই শালার ব্যাটা মোর সব আশা নষ্ট করি দিসে। বিয়াও করি সরাসরি বউ ধরি আইসছে মোর বাড়িত। সেলা মোর খুব রাগ হইছিল ব্যাটা। মুই বাড়ি থাকি ডাঙ্গে বাইর করি দিসু। ওর সৎ মাও কিন্তু মোর পাও ধইচ্ছিল যে, নিত্যান্দ যা কইচ্ছে কইচ্ছে ওক তুই বাইর করি দিন্না। মুই তোর কাকীর কথা শুন নাই। নিত্যান্দ রাগ করি বউ ধরিয়া ইন্ডিয়া চলি গেইসে। আর ওর ছোটটা মদন ওয় বাড়িতে ছিল।

পর্যবেক্ষক: ছোট ব্যাটা বলতে, তোমার যেইটা ব্যাটা মার্ডার হইসে?

অনীল: হ্যাঁ।

পর্যবেক্ষক: তারপর কি হইল?

অনীল: নিত্যানন্দ পাঁচ বছর পরে বউ ছাওয়া ধরিয়া আবার বাড়িত আইচ্ছিল। দুই তিন মাস ভালোই থাকিল। তারপর মোক একদিন কইল, বাবা তোর জমি জিরাত তোর তিন ব্যাটাক সমান করি ভাগ করি দে। মুইতো গরম হয়া গেইসিনু। মুই ওক কনু, মুই বাঁচি থাকিতে জমি ভাগ করি দেওয়া হবার নয়। নাগি গেইল ঝগড়া। ঝগড়ার সময় ওয় মোর গলা চিপি ধইচ্ছিল। মুইতো অজ্ঞান হয়া গেইসিনু। পরে মোক হাসপিতাল ধরি গেইসিলো।

শশী রানী: নিত্যান্দ ঐদিনে কইসিলো। মোক জমি রেজিষ্ট্রি নাদিলে এইটা বাড়িত মার্ডার হবে। হামেরা চেয়ারম্যানের ঠে গেইসিনো। চেয়ারম্যান কইসিলো একখান জিডি করিবার। তোর কাকাও গেইসিলো থানাত জিডি করিবার। মুই করির দেও নাই। মুই কনু রাগের মাথায় যা হবার হইসে। তোরে তো ব্যাটা কিছুই হবার নয়।

পর্যবেক্ষক: তারপর কি হইল?

শশী রানী: তোর কাকা সুস্থ হবার পর আবার একদিন নিত্যানন্দ তোর কাকাক কইল জমির রেজিষ্ট্রি দিবার তেনে। তোর কাকা তিন ব্যাটাক ডাকাইল। নিত্যানন্দ বাদে বাকী দুই ব্যাটাক কহিছিলো তোমরা কি মোর মরিবার আগতে জমি রেজিষ্ট্রি চান? নিত্যানন্দ কইসিলো জমি রেজিষ্ট্রি মোর লাগিবেই। স্বপন আর মদন না করিসে যে, এলায় জমি লাগিবা নয়। এই কাথা শুনি নিত্যানন্দ ক্ষ্যাপী গেইসিলো। নিত্যানন্দ কইসিলো বাবা তুই জমি কলাত ধরি আছিত। তোর জমি কেমন করি বাইর করির নাগে মুই নিত্যানন্দ করিম। দরকার হলে মার্ডার করিম।

পর্যবেক্ষক: নিত্যানন্দ জমির জন্য ব্যস্ত হইসিলো কেনে?

অনীল: বাপই জমি ওক মুই ঠিকই দিনু হয়। ওয় খেলায় জুয়া। আজি জমি লেখি দিম, তারপর জমি বেচাবে আর জুয়া খেলাবে। বাপ হয়া কি মুই এইলা সইজ্জ করির পাইন্ন হয়।

পর্যবেক্ষক: চাষ করিবার জমি দিলেই তো হলেক হয়।

অনীল: মুই ওক কইসিনু। নিত্যানন্দ তোক আবাদ করিবার ত্যানে তিন বিঘা জমি দেছ। ওয় মানিল নাই। ওক জমি রেজিষ্ট্রি লাগিবেই।

পর্যবেক্ষক: তারপর কি হইল কাকা?

অনীল: ঝগড়ার তিন দিন পর। মদন আর নিত্যানন্দ লাগি গেইল ঝগড়া।

পর্যবেক্ষক: ওদের দুই ভাইর ঝগড়া হইল কেনে?

শশী রানী: কারণ হচ্ছে, নিত্যানন্দ জমি রেজিষ্ট্রি করির চাছে। মদন না করে ক্যানে! তুমুল ঝগড়া শুরু হয় গেইসে। মদন (ছোট ভাই) রাগের মাথাত নিত্যানন্দক ধরি ডাঙ্গাইল। নিত্যানন্দের বউ মদনের পিঠত ডাঙ্গাইল। মদন বাঁশ দিয়া নিত্যানন্দের বউক ডাঙ দিবার যাবার ধইচ্ছিল। তোর কাকা আটকেবার গেইছিলো। বাঁশের বারিটা তোর কাকার পিঠত আসি লাগিল। আশেপাশের মানষি চলি আসিল। নিত্যানন্দ চিল্লাচিল্লি করি কছে আর মানষিক শুনাছে মদন ছোট ভাই হয়া মোকো ডাঙ্গাইল বাবাকো ডাঙ দিল। মানষি আসি মদনক দোষারোপ করছে। বাপ বড় ভাই যতই খারাপ হউক না ক্যানে ওমাক ডাঙ দেওয়া যাবার নয়। মানষিতো আর আসল কথা জানেনা।

পর্যবেক্ষক: কাকী তারপর কি হইল?

শশী রানী: মারামারি হইল বিকাল বেলা। সন্ধ্যাত সবাই ঘুমাইছিনি। মদন পূজা দেখির গেইসিলো রাতির বেলা। নিত্যানন্দ বাড়িতেই ছিল। মদনের বউ বাপের বাড়িত বেড়েবার গেইছিলো। সকাল বেলা ঘুম থাকি উঠিয়ায় বাহির

থাকি শুনা পানু, খুন হইছে, খুন হইছে। কায় খুন হইছে এইটা আর শোনা যাছে না। ছোট ব্যাটা স্বপনক ঘুম থাকি ডাকে তুলিনু। ওক কনু, স্বপন বাহেরত যায়া দেখি আয়তো কায় খুন হইছে। স্বপন ঘুম থাকি উঠি দৌড়ি চলি গেইল। মুই মদনক ডাকাছো। মদন আর শুনেনা। মদনের ঘরত চলি গেনু। যায়া দেখ মদন নাই। রাতিত যেমন করি ভাত তরকারি থুইয়া আইচ্ছু। দেখিনু ভাত তরকারি মদন খায় নাই। স্বপন দৌড়িয়া চলি আসিল। ওর শরীল কাঁপেছে। বারান্দাত ধুক্ করি বসি পড়িলেক। মুই কনু হারে স্বপন, কি হইল তোর শরীল কাঁপেছে কেনে? ছোট বেটি শেফালী চিৎকার করি করি বাড়িত চলি আসিল। আসি কইল মা, মদনদাক মানষি মারি ফেলাইছে। নদীর ধারত পড়ি আছে। এই কথা কইতে কইতে ওয় অজ্ঞান। বাড়িসহ চিল্লাচিল্লি শুরু হয়া গেল। পুলিশ চলি আসিল।

পর্যবেক্ষক: তারপর কি হইল?

শশী রানী: পুলিশ আসিয়া প্রথম নিত্যানন্দক জিজ্ঞাসা কইচ্ছিল? এই খুনটা কিভাবে হলো?

পর্যবেক্ষক: নিত্যানন্দ কী বলেছিলেন?

শশী রানী: কহিছিলো, মোর সৎমার বুদ্ধিত মোর বাবা মোর ছোট ভাইক খুন কইচ্ছে। মোকো মারিবার ত্যানে অনেক ফন্দি কইচ্ছে।

পর্যবেক্ষক: কাকা কিছু কহে নাই।

অনীল: পুলিশ আসি মোক কইল, আপনি আপনার ছেলেকে খুন করেছেন? মুই কনু, হ্যা মুই নিজের হাতত মোর ব্যাটাক খুন কইচ্ছু। মোক ধরি যাও। তোর কাকী সেলা চিল্লিয়া পুলিশক কহিসিলো, মোর ভাতার খুন করে নাই। মুই খুন কইচ্ছু। গ্রামের মানষিলা সব চায়া চায়া ছিল। পুলিশ মোক আর তোর কাকাক থানাত ধরি নিয়া গেল। তিনদিন পর হামাকা পঞ্চগড় জেলখানাত নিয়া গেল।

পর্যবেক্ষক: আর নিত্যানন্দ।

শশী রানী: নিত্যানন্দ হয়া গেল বাড়ির রাজা।

পর্যবেক্ষক: স্বপন, শেফালী কোনঠে ছিল?

শশী রানী: স্বপন বাড়িতেই ছিল। শেফালীক ওর মামা নিয়া গেইসিলো।

পর্যবেক্ষক: স্বপন খাওয়া দাওয়া কোনঠে কইচ্ছে?

শশী রানী: বাড়িতে নিজেই রান্না করি খাইছে?

পর্যবেক্ষক: আর নিত্যানন্দ?

শশী রানী: ওয় বাড়িতেই ছিল। ওয় আলাদা খাইসে। স্বপনক কিচ্ছুই দেয় নাই। বাড়িত বড় বড় গাছ ছিল। সব বেচে ফেলাইছে। জমি জিরাত যা ছিল, সব বন্দক দিছিলো নিত্যানন্দ।

পর্যবেক্ষক: জেলখানায় কতদিন ছিলেন?

শশী রানী: আট মাস ছিনি।

পর্যবেক্ষক: এতো তাড়াতাড়ি মুক্তি পাইলেন কেমন করি।

শশী রানী: মিথ্যা কি আর চাপা থাকে। স্বাক্ষী ছিল এগারো জন। প্রথম তিন থেকে চাইর বার স্বাক্ষী কোর্টে মিথ্যা স্বাক্ষী দেয়। স্বাক্ষীঘরের কথায় মিল ছিল না। ছয় মাস পর এক স্বাক্ষীর সাত বছরের বেটি পানিত ডুবিয়া মরিয়া গেইছিল। পরে একদিন কোর্টে স্বাক্ষী দিবার সময় স্বাক্ষী কহিলেক, নিত্যানন্দ নিজে ওর ছোট ভাইক খুন কইচ্ছে। আগতে থানার পুলিশক নিত্যানন্দ মেলা টাকা দিছিলো। হামাকো টাকা দিছে। মুই নিজে দেখো নাই, তবে মোর ধারণা নিত্যানন্দ নিজের হাতত ওর ছোট ভাইক খুন করিসে। খুন না করিলে হামাক কেনে স্বাক্ষী বানাবে। বাড়ী

যায়া যায়া মোক টাকা দেয় আর মিথ্যা স্বাক্ষী দিবার কয়। যাতে নিত্যানন্দের বাবা মার আজীবন জেলত থাকিবার নাগে।

এরপর দুই মাস পর। মুই আর তোর কাকা জেল থাকি চলি আসিনো। মামলা সেলাও শেষ হয় নাই।

পর্যবেক্ষক: তারপর কি হইল?

শশী রানী: বাড়িত আসি দেখো, নিত্যানন্দ বাড়িত নাই। বউ নিয়া শ্বশুর বাড়িত চলি গেইছে। আসি দেখ স্বপন নিজে রান্না করি খাছে। শেফালী মামার বাড়িত চলি গেইসে। বাড়িত গরু ছাগল যা ছিল নিত্যানন্দ বেচে ফেলাইছে। ধান, চাউল, পাঠ, সরিষা, গম, বাদাম ঘরোত কিচ্ছুই নাই।

পর্যবেক্ষক: তারপরে তোমরা নিত্যানন্দের খোঁজ করেন নাই।

শশী রানী: ওয় তো ভয়ে চলি গেইছে। তোর কাকা ওর নামে মামলা করিবার চাইছিলো। মুই করিবার দেও নাই। করি আর কি হবে? ব্যাটায় হয়। মুই যতই সৎ মাও হও। তোর কাকাক কিছুই করির দেও নাই।

পর্যবেক্ষক: নিত্যানন্দ বাড়িত আইসে নাই?

শশী রানী: একদিন রাইতত হামেরা ঘুমাইসি। নিত্যানন্দ মাও, মাও করি ডাকাছে। ঘুম থাকি উঠিনু। ওয় ঘরোত আসিল। আসিয়ায় তোর কাকার পাও ধরি কান্দেছে। ওর বাপ কছে। কি হইছেরে নিত্যানন্দ কান্দিস ক্যানে? বাড়ি থাকি বাইর হয়া যা। মোক জেলত ডুকিয়া তোর শান্তি হয় নাই। এলা কি মোক মারির আইচ্ছিত? নিত্যানন্দ কহিলেক, বাবা মোর ভুল হয়া গেইসে। মুই থাকিবার আইস নাই। মোরো পাও ধরি কান্দেছে। কান্দি কান্দি কছে। মা, মুই আর বাংলাদেশত থাকিবার নও। ইন্ডিয়া চলি যাইম। মোক বিশ হাজার টাকা দে। তোর কাকাতো দিবারে দিবানয়। সেলা মুই ধান বেচা দশ হাজার টাকা ওর হাতত দিনু আর কনু এই দশ হাজার টাকা দিয়া তোক আশীর্বাদ করি দিনু। ভারত যায়া ব্যবসা করি খাইস। আর বাংলাদেশত আসিন্না। আসিলে পুলিশ তোক

ধরিবে। যা এলায় চলি যা। নিত্যানন্দ আবার মোর পাও ধরিলেক, আর কলেক মা আশীর্বাদ করিস মোর ভুল হয় গেইসে। আইজ রাইততে ইন্ডিয়া চলি যাইম। যাওয়ার সময় স্বপন আর শেফালীক বুকত নিয়া অনেক কান্দিছে। আর শেফালীক ওর হাতের বিয়ার সোনার আংটিখান দিসে। তারপর ওয় চলি গেইছে। আইজ দশ বছর হইল ওয় আর দেশত আইসে নাই।

পর্যবেক্ষক: তোমরা ওর খোঁজ খবর নেন নাই।

শশী রানী: বছরে দুই একবার কাথা হয় ফোনত।

পর্যবেক্ষক: জেলখানায় কাকার সাথে আপনার দেখা হইতো না।

শশী রানী: না ওইলা সুযোগ নাই। ওইটা জেলখানা। বন্দী জীবন ভিতরত। ওঠে খাবার আছে, ওয়ার্ডে গল্প করা যায়, ঘুম পারা যায়। কিন্তু বাহির হওয়া যায় না। আট মাসের মধ্যে পাঁচ থাকি ছয় বার তোর কাকার সাথে কোর্টৌত দেখা হইসে। কিন্তু একটা কথা কবার পারি নাই তোর কাকার সাথে।

পর্যবেক্ষক: মহিলা ওয়ার্ডত খাবার কেনঙ ছিল?

শশী রানী: জেলখানাত খাবার খাবার মনায় না। উটি, ভাত আর পাতলা ডাইল খাইতে খাইতে মোর জিউ শুকি গেইসে। তরকারি শিদ্ধ হয় না। খাসির ঠুমা দাত দিয়াও টানি ছিড়া যায়না।

পর্যবেক্ষক: ইচ্ছা করিলে ভালো খাবার খাওয়া যায় না?

শশী রানী: টাকা হলে ওঠে সব পাওয়া যায়। যার টাকা আছে ওয় ভালো মন্দ খাবার পারে। যার নাই ওক কষ্ট করি থাকির নাগে।

পর্যবেক্ষক: আসামীর কাছত টাকা থাকিবে কেনং করি।

শশী রানী: আরে বাড়িত থাকি টাকা দিয়া আইসে না। নিজের হাতত টাকা থাকে না। টাকা দিবার যায়গা আছে। তুই যেইলা খাবার চাবো ওমরা খাবার দিবে। তোর যেইলা টাকা জমা আছে ওঠে থাকি কাটি নিবে।

পর্যবেক্ষক: খাবারের দাম কেনং?

অনীল: হ্যা, ওঠে খাবারের দাম মেল্লা। ১০ টাকার জিনিস ৩০ টাকা দিয়া কিনিবার লাগে। কিন্তুক টাকা থাকিলে ওঠে সব পাওয়া যায়।

পর্যবেক্ষক: টাকাটা নেয় কায়?

অনীল: জেলখানার পুলিশঘর নেছে। ওঠে ম্যাড আছে। ম্যাড হামার ঠে টাকা নেয়। টাকা নাই কিচ্ছু নাই। টাকা আছে মুক্তি ছাড়া সব আছে।

পর্যবেক্ষক: কাকী? তোমার সময় কেনং করি কাটিসে?

শশী রানী: জেলখানাত খুব কষ্ট বারে। ব্যাটা, ব্যাটি থুইয়া ওঠে কি আর ভালো লাগে।

পর্যবেক্ষক: শেফালী আর স্বপন দেখা করিবার যায় নাই।

শশী রানী: গেইসিলো। পরে মুই যাবার না করি দিসু। শেফালীটা খালি কান্দে। ওইলা দেখিলে কি আর ভালো লাগে।

পর্যবেক্ষক: অন্যান্য নারী আসামীরা অবসর সময়ে কি করিসে।

শশী রানী: কাহ কাহ গল্প করে, কাহ কাহ খালি কান্দে, কাহ লুডু খেলায়, কাহ টিভি দেখে। তাহ সময় কাটিবার চায় না। দিন খান যায়ে না। একজন মুক্তি পায় আরেক জন চিৎকার করি কান্দে। ব্যাটা, ব্যাটি দেখির আসিলে সারাদিন মন খারাপ থাকে।

পর্যবেক্ষক: ঝগড়া হয় না?

শশী রানী: খালি ঝগড়া! মারামারিও হয়। কয়দিন পর পরে মারামারি হয়। আর যেইল্যা মাদকের আসামী ওইল্যার মুখের ভাষা খুব খারাপ। ওমার নগত কাহয় কথা কবার চায় না। ওমরা ওমরায় ঝগড়া করে। ঝগড়া কইত্তে কইত্তে চুলি টানাটানি শুরু হয়ে যায়। মহিলা পুলিশ আসিয়া দেয় ডাঙ। ডাঙ খায়াও কিছুই মনে করেনা। আবার ঝগড়া করে।

পর্যবেক্ষক: গান, বাজনা হয়না ওঠেনা।

শশী রানী: কান্দি কাটি দিশা নাইও আর গান, বাজনা। ওইল্যা কিচ্ছু নাই। খালি গল্প করে। তবে দুই একজন ছিল গালা ছাড়ি দিয়া গান গাইতো।

অনীল: হামার ওয়ার্ডত কিন্তু গান, বাজনা ছিল। হারমোনিয়াম ছিল। একজন গান কবার শুরু করলে বাকি সব্বাই চলি আইসে। গান গাইতে গাইতে কাহ হাসে, কাহ কান্দে, কাহ ফুটবল ক্রিকেট খেলায়।

পর্যবেক্ষক: পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কেমন ছিল?

অনীল: জেলখানা পরিষ্কার। সারাদিনে পরিষ্কার করে।

পর্যবেক্ষক: কায় পরিষ্কার করে।

অনীল: আসামী ঘরে পরিষ্কার করে। দায়িত্ব ভাগ করি দেওয়া আছে।

পর্যবেক্ষক: সবারে কি কাজ করিবার লাগে?

অনীল: না, সবার করিবার লাগে না।

পর্যবেক্ষক: জেল খানায় আপনার মনের অবস্থা কেমন ছিল?

অনীল: খুব খারাপ বারে। খুন না করিয়াও মুই মার্ডার কেসের আসামী। এই খান মুই মানিবারে পারো নাই। এলাও মানিবার পারনা। ঘুম হয় না জেলত। ভিতরত খুব আইন। একটুক উনিশ বিশ হলে শুরু হয় বিচার।

মাইর ডাঙও করে। দিন কাটিবার চায়না। খালি মনটা কয় কবে বাড়ি যাম। যদি কারো মুক্তি হয়। সবায় কাছত যায়। কাহ কান্দে কাহ হাসে।

পর্যবেক্ষক: জেলত আপনার কোন জিনিসটা খুব ভালো লাগতো? আবার কোনটা খুব খারাপ লাগতো?

অনীল: ভালো মন্দ সবে আছে বারে। ওঠে গেলে জীবনটাক বুঝা যায়। মেল্লা মানষির সাথে মেশা যায়। সুখ দুঃখের গল্প করা যায়। তবে ওঠে খুব দুর্নীতি হয়। টাকার জোরে অনেকে অনেক কিছু করি ফেলায়। যারা মেল্লা দিন থাকি জেলত আছে ওমরা খালি পাওয়ার দেখায়। ওমরাও ঘুষ খায়। এইটা মোর ভালো লাগে না।

পর্যবেক্ষক: ওঠেনা গান বাজনা হলে কেমন হয়?

অনীল: এইটা হইলে ভালো হয়। গান বাজনা হইলে মন খান ভালো থাকে। ওঠে জ্যালা ছিনু। মোর যখন খুব কষ্ট হইতো সেলা মুই কীর্ত্তনের গান গাইতাম। তখন মনটা ভালো হয়া যায়।

কারাবন্দীর অভিজ্ঞতা- ১০

আজাহারুল হান্নান (ছদ্মনাম) বর্তমান বয়স ৮৩ বছর। গাইবান্ধা নিবাসী আজাহারুল হান্নান অধ্যাপনা করেছেন রংপুর বিভাগের স্বনামধন্য একটি সরকারি কলেজে। ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৮ সাল এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে ২৭ মাস জেল খাটেন। কারাবরণের প্রধান কারণ ছিল রাজনৈতিক আটকাদেশ। কারা জীবন অতিবাহিত করেছেন গাইবান্ধা জেলা কারাগার, রংপুর কেন্দ্রীয় ও সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারে। বন্দী জীবনে খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা, বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাসহ বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলেন। নিম্নে তার কারা অন্তরীণ অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হলো-

আজাহারুল হান্নান: জেল জীবনতো অনেক ঘটনাই ছিল। একদিন দেখা গেল একটা ওয়ার্ডে হিন্দু মুসলমান সকলেই আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলে চিৎকার করতেছিল। এমন মনে হচ্ছিল যেন সৃষ্টিকর্তা তাদের কাছে নেমে

আসবেন। আর কিছু লোক হ্যাস্কো ব্লেড দিয়ে জানালারগ্রিল কাটতে ছিলেন। আবার কিছু লোক চটের বস্তা ভিজিয়ে নিচ থেকে উপরে দিচ্ছিলেন। যেন এতে বেয়ে পালিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু ইতোমধ্যে সেখানে পুলিশ চলে আসে। আর সকল কারাবন্দী ওয়ার্ডে চলে আসে। পুলিশ সকলকেই মারতে শুরু করে। আল্লাহু শব্দ বন্ধ হয়ে যায়। আর কয়েদিরা লাঠির আঘাতে চিৎকার করতে থাকে। একি বিকট চিৎকার যেটা সহ্য করার মতো নয়। মানুষ মানুষকে এভাবে মারতে পারে! অনেকের রক্ত বেড়িয়ে গিয়েছিল। আমাদের সময় অনেক বিপ্লবী পালিয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে যাদের যাবৎ জীবন জেল হয়। এরা অনেকেই আর চার দেয়ালের বন্দী জীবন সহ্য করতে পারেনা। বার বার পালিয়ে যেতে চাইতো। রাতের বেলা গলা ছেড়ে চিৎকার করে কান্না করতো অনেকেই। এই ক্রন্দন শোনার পরে বাকী সব কয়েদিরা তার কাছে ছুটে চলে আসে। সান্ত্বনা দিতে দিতে তারাও একটা সময় কানায় করে অশ্রু সজল হয়ে যেত।

এই ধরণের হতাশার মধ্যে সাংস্কৃতিক চর্চা কারাবন্দীদের মনোদৈহিক বিকাশের ক্ষেত্রে একটা ভূমিকা রাখতে পারে এবং এটার খুব দরকার। আমি যখন জেলে ছিলাম তখন অনেকেই গান করতো, লেখালিখি করতো। কিন্তু অনেক বিধি নিষেধ ছিল। তবে আমি শুনি যে, বর্তমান জেলখানায় টেলিভিশন আছে। নিউজপেপার দিচ্ছে। আমাদের সময় মূলত একটি নিউজপেপার দেওয়া হতো। আগের দিনের পেপার পরের দিনে দিত। আবার স্পেশাল ব্রাঞ্চ কখনো নিউজ পেপার এর কিছু অংশ কেটে নিত। কারণ অপ্রীতিকর ঘটনা সংবাদপত্রে থাকলে ঐ অংশটা কেটে নেওয়া হতো। আমার এখনও মনে আছে। তখন সিলেট জেলখানা থেকে তিনজন আসামি পালিয়ে গিয়েছিল। এই সংবাদটা পেপারে ছিল। আমি নিউজটা পড়তেছিলাম। এমন সময় এক কারা রক্ষী এসে সিলেটের আসামী পালিয়ে যাওয়ার সংবাদটা কেটে নিয়ে গিয়েছিল। আমি বলছিলাম কেন কাটলেন? কারারক্ষী বললেন, এই ধরণের সংবাদ জেলের ভিতরে দেওয়া নিষেধ। এতে করে কারা অভ্যন্তরে গন্ডগোল সৃষ্টি হবে।

অনেকেই পালিয়ে যাওয়ার চিন্তা করবে। ফলে কারাগারের শৃঙ্খলা নষ্ট হবে। এছাড়া উত্তেজনাকর রাজনৈতিক খবর কখনোই পড়তে দেওয়া হতো না। খারাপ কোন নিউজ জেলের আসামিরা পড়বে না। ঐ সময় কাজটা বাংলাদেশের জেলে বেশি হত তা হলো জেল কর্তৃপক্ষ কখনোই সরকারের বিরুদ্ধে কোন নিউজ দেখাতো না। ব্রিটিশ আমলে কারাগার বলতে বুঝানো হতো সাজা। কথায় কথায় মারধর, অত্যাচার নির্যাতন। ব্রিটিশরা মূলত একটি দেশকে দখল করে রাখার জন্য যা যা প্রয়োজন ছিল জেলখানার মধ্যে তাই তারা করত। ভয়-ভীতি দেখাত। তাদের মানবিক কোন দিক ছিল না। তখন এখানে অমানবিক নির্যাতন চালানো হতো। কিন্তু এখন তো স্বাধীন দেশ। স্বাধীন দেশে একজন চোর ডাকাত ছিনতাইকারী যেকোনো অপরাধী তার মৌলিক অধিকার পাবার অধিকার রয়েছে। কারণ এই অধিকার তার জন্মগত অধিকার। এই অধিকার আসলে হনন করার ক্ষমতা কিন্তু কারো নাই। কারণ অনেক সময় চোর-ডাকাতদের সাথে বিনা অপরাধে অনেকে নিরপরাধ ফেঁসে গিয়ে জেলে যায়। সে ক্ষেত্রে যদি ও নিরপরাধ মানুষটির সাথেও একই আচরণ করা হয় তাহলে তো আসলে সে একটা পর্যায়ে গিয়ে খারাপ মানুষে পরিণত হয়ে যাবে। এখন কারাগারগুলো হওয়া উচিত সংশোধনাগার। সে ক্ষেত্রে একটা মানুষ যখন অপরাধ করে, আর অপরাধ করার পর যখন জেলে যায় তখন তার সাথে অপরাধীসুলভ আচরণ করা সমীচীন নয়। কারণ অপরাধীর শাস্তি হওয়া উচিত। তবে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য চাহিদা মোতাবেক নাচ, গান, নাটক, আবৃতি, সাহিত্য পাঠ, অঙ্কন এবং দেশীয় সংস্কৃতির প্রসার করতে হবে।

মহিলাদের জন্য জেলখানাটা আরও অমানবিক। নারী কয়েদিরা অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃতির আকাশটাকেও দেখতে পায়না। ছেলেরা তো তাও বাইরে একটু ঘুরে বেড়াতে পারে। আকাশ দেখতে পারে। কিন্তু মহিলারা এ ধরনের কোনো সুযোগ পায়না। কারণ অনেক নারী পেটে বাচ্চা নিয়ে জেলখানায় আসে। একজন গর্ভবতী নারীর যে পরিমান সেবা যত্ন দরকার তার ১০% সেবাও সে পায় না। অনেকর প্রসব বেদনা ওঠে। তাদের জীবনটা আরও

দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। তারা বলতেও পারেনা সহ্যও করতে পারেনা। আমাদের সময়ে ছিল এরকম একটা কঠিন পরিস্থিতি। আমার কলিগের ওয়াইফ জেলখানায় ছিল। সে মূলত প্র্যাগনেন্ট অবস্থায় জেলখানায় আসছিল। আমার কলিগ আমার ওয়ার্ডেই ছিল। স্ত্রীর সাথে দেখা পাওয়ার কোনো ব্যবস্থা ছিলনা। একদিন রাত বারোটায় ভাবীর প্রসব বেদনা ওঠে। আমরা খবর পেলাম। ভাবীকে মহিলা ওয়ার্ড থেকে বের করে আনা হলো। জেলারকে অনেক সুপারিশ আকুতি মিনতি করেও ভাবীকে রংপুর মেডিকেলে নিয়ে যেতে পারিনি। আমার কলিগ জেলের ওয়ার্ডে শুধু পায়চারি করছিল। আর আমাদের রাজবন্দীদের অনুরোধ করছিল। ভাই, আপনার ভাবীকে একটু মেডিকেলে নেওয়ার ব্যবস্থা করেন। জেলারকে বলেন। রাত চারটার দিকে কারা মেডিকেলে ভাবীকে নিয়ে যাওয়া হয়। ভোর পাঁচটার দিকে খবর পেলাম ভাবী একটি কন্যা সন্তান জন্ম দিয়ে পরকালে পাড়ি জমিয়েছেন। আমরা আমার কলিগকে খবর দিলাম না। শুধু বলেছিলাম আপনার ঘরে একটি রাজকন্যার আবির্ভাব হয়েছে। এইখবর শুনে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না করতেছিল। বড্ড অসময়ে তোর জন্মটা হলো মেয়েটার আমাকে বলল, আপনার ভাবী কেমন আছে? মুখটা ভারী করে বললাম ভাবীর খবর জানিনা। তবে শুনলাম তার শরীরটা খুব বেশি ভালো নেই। আমার নীরবে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল মাত্র। সকাল সাতটায় জেলখানার সামনে কয়েকজন নারী কয়েদি বাচ্চাটিকে কাপড় জড়িয়ে নিয়ে আসছিল। তার কয়েক মিনিট পরে ভাবীর লাশটা সামনে আনা হলো। ওয়ার্ডের সবাই আমরা বের হয়ে আসলাম। নারী ওয়ার্ডেরও সবাই বের হয়ে আসছে। সেদিন এই মৃত্যুটাই নারী বন্দীদের অবস্থায় প্রকৃতির আকাশ দেখার সৌভাগ্য করে দিয়েছিল। আমার কলিগ নীরবে হেঁটে আসলেন তার স্ত্রীর লাশের সামনে। হতবাক সে। চোখে একফোঁটা অশ্রু ছিলনা তার। বাচ্চাটিকে তাঁর কোলে দেওয়া হয়েছিল। এক দৃষ্টিতে বাচ্চার দিকে তাকিয়ে ছিল। ইতিমধ্যে তার বৃদ্ধ মা সেখানে উপস্থিত হয়। ছেলের গলা জড়িয়ে কান্না করছিল। একটু পরে তার মাকে সরিয়ে নেওয়া হলো। পিচ্চিটাকে আমি কোলে নিয়েছিলাম। হঠাৎ করে একজন বলে

উঠলো বিপ্লব করতে গিয়ে ওর মা বাবা চার দেয়ালে বন্দী। মা মারা গিয়েছে তাই ওর নাম রাখা হলো "বিপ্লবী"। সবাই -স্লোগান দিয়ে উঠলো, "বিপ্লবী" তুমি চিরজীবী হও। সবাই কান্না করছিল। লাশটিকে সরানো হলো। আমার কলিগ শুধু চেয়ে দেখেছিলেন। বাচ্চাটিকে নারী ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেদিনের অবুঝ শিশুটির ক্রন্দনে রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের বৃক্ষের পাতাগুলোও নীরব হয়েছিল। এই ঘটনাটি আমার একটি বইয়ের মধ্যে লিপীবদ্ধ করেছি। বইটির নাম ''কারাগারে কারাবাসে''। বইটি আমি জেলে থাকা অবস্থায় সিগারেটের প্যাকেটের মধ্যে লিখেছিলাম। পরবর্তীতে ''অনন্যা প্রকাশনী'' থেকে বইটি প্রকাশ করা হয়।

একদিন সকালবেলা একজন কারারক্ষী ১৫-১৬ বছরের একটি যুবককে আমার পাশের ওয়ার্ডে রেখে গেলো। ছেলেটিকে কয়েকদিন অবজারভেশন করলাম। দেখলাম ছেলেটি কারো সাথেই কথা বলেনা। নীরবে বসে থাকে। একদিন রাতের বেলা ছেলেটির কাছে গেলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম। বাবা তোমার কি হয়েছে? যদি কিছু মনে না করো তাহলে বল। ছেলেটি আস্তে করে বলল, - স্যার আপনি একজন শিক্ষক মানুষ আমি কারা রক্ষীর কাছে শুনেছি। আপনাকে সবাই খুব পছন্দ করে। স্যার আপনি আমাকে জেল থেকে বের করার ব্যবস্থা করেন। স্যার আমার কোনো অপরাধ নেই। কেউ আমার কথা শোনেনা। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার বাড়িতে কে কে আাছেন? ও বললো-স্যার আমার বয়স যখন সাত আমার মা আমার বাবাকে ছেড়ে চলে আসে। নানার বাড়িতে কিছুদিন ছিলাম। নানা মারা যাওয়ার পরে আমার মা ভাগের সম্পত্তির কথা বললে আমার দুই মামার সাথে আমার মায়ের ঝগড়া এবং মারামারি হয়। আমার মায়ের মাথা ফেটে যায়। সুস্থ হওয়ার পরে আমার মা গাইবান্ধা থেকে রাগ করে আমাকে নিয়ে রংপুরে চলে আসে। একটা বাসায় কাজ করতো আমার মা। এভাবেই দিন চলতো। আমিও আস্তে আস্তে বড় হতে থাকি। মায়ের কিছু জমানো টাকা দিয়ে রংপুরের পিরগাছা থানায় চারশতক জমি কিনে কোনোরকম একটা শোলার ঘর দিয়ে আমরা থাকতাম। পরে হঠাৎ একদিন আমার বাড়ি থেকে তিন-

চার কিলোমিটার দূরে হবে। আমি শুনলাম একটি লোককে মেরে নদীর কিনারে রাখা হয়েছে। সবাই দেখতে যাচ্ছিল। আমিও গিয়েছিলাম দেখতে। দাঁড়িয়ে লাশ দেখতেছিলাম। হঠাৎ করে তিনজন পুলিশ এসে আমাকে হ্যান্ডক্যাপ লাগায়। আমি কিছু বোঝার আগেই আমাকে গাইবান্ধা থানায় পাঠানো হলো। আমি পুলিশকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার কি অপরাধ, আমাকে ধরে এনেছেন কেন? পুলিশ বলল, তোকে খুনের দায়ে সন্দেহ করে এখানে ধরে আনা হয়েছে। আমাকে গাইবান্ধা জেলখানায় পাঠানো হলো। ওখানে দুই বছর ছিলাম। তারপরে আমাকে রংপুর জেলখানায় পাঠানো হলো। তাকে জিজ্ঞেস করলাম তোমার মা তোমাকে দেখতে আসে না? ও বলল, আমার মা বেঁচে আছে কি মরে গেছে আমি জানিনা। আর আমি যে জেলখানায় আমার মা হয়তো এটা জানেই না। মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগল, রংপুরের আসামি গাইবান্ধায় কেন? ছেলেটি কথা বলতে বলতে কান্না করেছিল। আর বলেছিল স্যার, আমি মুক্ত হই বা না হই, আমার মাকে যদি একবার দেখতে পেতাম। স্যার, দয়া করে আপনি যদি আমার এই ব্যবস্থাটা করে দিতেন। আমি একদিন রংপুর জেলের জেলারের সাথে কথা বললাম। জেলার আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছোট ভাই। জেলার বলল, আমার চাকরীর বয়স মাত্র তিন বছর। আমি রংপুরের কিছুই চিনিনা। তবে ঐ ছেলেকে আমি কয়েকবার ঠিকানার কথা বলেছিলাম। কিন্তু ঐ ঠিকানায় ওর মাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। জেলার আমাকে আশ্বস্ত করলেন, আমি বিষয়টা আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করবো একটা সমাধান করার। কয়েকদিন পরে হঠাৎ করে জেলার আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, স্যার আপনার সেই ছেলের মাকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে ওর মা এখানে আসবে। ওর মা অনেক অসুস্থ। এই অবস্থায় ছেলের সাথে কি মায়ের দেখা করানো উচিত হবে। আমি বললাম, আপনি যেটা ভালো মনে হয় করেন। জেলার বললেন, এটাতো সন্দেহমূলক কেস। এক মাসের মধ্যে আমি ওর জামিনের ব্যবস্থার চেষ্টা করছি। অসুস্থ অবস্থায় ছেলেকে দেখে অসুস্থ মায়ের অন্যরকম পরিস্থিতি হতে পারে। আমি বললাম, ঠিক আছে জামিনের ব্যবস্থা করা যায় কিনা?

ইতিমধ্যে সেই ছেলের মাকে জেলারের রুমে আনা হলো। ছেলের মা ডুকরে ডুকরে কাঁদছিল আর বলছিল, মোর ব্যাটা ছৈলটা কোঠে? জেলার বললেন, আজকে দেখা করার সময় শেষ। আগামী সপ্তাহে ওর জামিন হবে। আমি সব ব্যবস্থা করেছি। সেদিন একবারে ওকে নিয়ে যাইয়েন বাসায়। ছেলের মা বলছিল, "বাবা! মোর ব্যাটাক আইজ তিন বচ্ছর থাকি দেখনা। খুব দেইখবার মন চাইছে। দূর থাকি মোর বাজানক কনেক দেইখবার চাও। " জেলার বললেন না আজ হবেনা। ছেলের মা অনেক আকুতি মিনতি করেও ছেলের মুখটা আর দর্শন করতে পারলো না। সাতদিন পর ঐ ছেলের জামিনের কথা ছিল। ছেলের মা সারাদিন কোর্টে বসে ছিল। সেদিনও ছেলের মুক্তি মেলেনি। সন্ধ্যায় জেলখানায় এসেছিলেন ছেলেকে দেখবে বলে। কিন্তু সন্ধ্যায় দেখা করার কোনো সুযোগ নেই। আমি ঐ ছেলেকে বললাম তোমার মাকে খুঁজে পাওয়া গেছে। কয়েকদিনের মধ্যে তোমার জামিন হবে। আবার তুমি তোমার মায়ের দেখা পাবে। ছেলেটা আমার পা ছুঁয়ে সালাম করলো। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। তার এগারো দিন পর আমি রাতের বেলা ওয়ার্ডে হাঁটাহাঁটি করছিলাম। হঠাৎ চোখ পড়লো ওই ছেলের ওয়ার্ডের দিকে। দেখি ছেলেটা শুয়ে আছে। শরীরটা কঙ্কালের মতো হয়ে গেছে। মুখের মধ্যে মাছি পড়ে আছে। শরীরে দুর্গন্ধ। আমি ওর কাছে গেলাম। আমার দিকে ছেলেটি চেয়ে রইল। কোনো কথা বলল না। আমি ওকে বললাম, কালকে তোমার জামিন হবেই। ছেলেটি ঠোঁট নাড়িয়ে কি জানি বলল শুনতে পেলাম না। তারপরের দিন বিকাল বেলা শুনলাম, ছেলেটির জামিন হয়েছে। ওর মা ওকে নিতে এসেছিল গেইটে। কিন্তু ছেলেটি কিছুক্ষণ আগে ইহকালের মায়া ত্যাগ করে পরকালে পাড়ি জমিয়েছেন। জীবন্ত এক সিনেমার জন্ম নিয়েছিল সেই রংপুর কারাগারে। এই ঘটনার পর মানসিক ভীষণ ভেঙে পড়েছিলাম। জেলখানায় পারস্পারিক সহযোগীতাপূর্ণ মনোভাব ছিল একজন আরেক জনের প্রতিবেশী। যে কারো কোন সমস্যা হলে সবাই এসে তার পাশে এসে দাঁড়ায়। কেউ অসুস্থ হলে বাকিরা তার সেবা-যত্ন করার চেষ্টা করে। তবে জেলের মধ্যে আবার অনেক সময় মারামারি হয়।

যেমন কেউ কারো মাথা ফাটিয়েছে। চারিদিকে হুলস্থুল শুরু হয়ে যায়। জেল কর্তৃপক্ষ এসে লাঠিপেটা করে। ওয়ার্ডে ঢুকতে দেরী হলে তখন তাকে মারে এবং বলে যে তাড়াতাড়ি ঢোকো। অনেক সময় জেলার এসে মারামারি বা অভ্যন্তরীণ কোনো সমস্যা হলে বিচার করে সমাধান করে।

জেলখানায় আমার মানসিক অবস্থা খুব একটা ভালো ছিলনা। মাঝে মাঝে জেলখানায় দেখা করতে আসতো আমার মা আর স্ত্রী, ছোট ভাই। ওরা অনেক কান্না করতো। যখন আমি সিলেট জেলে চলে গেলাম। ওখানে প্রায় এক বছর ছিলাম। তখন আমার আর দেখা হয়নি পরিবারের কারো সাথে। শেষের দিকে পরিবারের লোকজন মাঝে মাঝেই না খেয়ে থাকতো। কান্না, দুঃখ, বেদনা এবং খুব হতাশার মধ্যে দিন যাচ্ছিল। পকেটে টাকা পয়সাও ছিলনা তেমন। হঠাৎ ডেপুটি জেলার এসে বললেন, কালকে আপনার জামিন হবে। খুব খুশি হলাম। চোখ দিয়ে পানি ছল ছল করছিল। ওয়ার্ডের সবাইকে বললাম যে, কালকে আমি চলে যাচ্ছি। সবার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। আমার কাপড় চোপড় যা ছিল গরীব কারাবন্দীদের দিয়ে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম বাসায় গেলে তো আমার কোনো সমস্যা নাই। রাতে জেলার আমাকে ডাকলেন। আমি খুব খুশি হয়ে তার কাছে গেলাম। তাকে গিয়ে বললাম, আপনাকে ধন্যবাদ আমাকে জামিনের ব্যবস্থা করার জন্য। জেলার অবাক হয়ে বললেন, আপনার জামিন হবে কালকে আমি জানলাম না! আমি বললাম ডেপুটি জেলার আমাকে সব বলেছে। তিনি ডেপুটি জেলারকে ডাকলেন। বললেন স্যারের জামিনের কথা আপনাকে কে বলেছে? ডেপুটি জেলার বলল কেন কাগজে তো তাই দেখলাম। জেলার কাগজ চেক করলেন এবং বললেন এটা আপনার সিলেট জেলখানায় প্রেরণের নোটিশ। ...সেদিনের কষ্টের কথা আমি আজও ভুলতে পারি নাই। চোখের পানি মুছতে মুছতে আবার ওয়ার্ডে চলে গেলাম। অনেকেরই আশা ভঙ্গ হয়ে গেল। অনেকে আমাকে দায়িত্ব দিয়েছিল। আমি যেন তাদের বাসায় গিয়ে খোঁজ খবর করি এবং জামিনের ব্যবস্থা করি। সেদিন খুব লজ্জাও পেয়েছিলাম।

তবে শুনেছি এখন তো আর জেলখানা বলতে কিছুনাই। এখন জেলখানাকে বলা হয় সংশোধনাগার। আসলে আমি সংশোধনাগার বলতে যেটা বোঝাচ্ছি, সেটা হচ্ছে জেলখানার যে ইথিকস এই প্রেক্ষিতে যদি বলি এটা এখন আর জেলখানা না। অর্থাৎ অপরাধীকে সাজার জন্য এখানে আনা হয়না। আনা হয় সংশোধন করার জন্য। মূলত এই বিবেচনা নিয়েই জেলখানাগুলো এখন চলে। তোমরা খোঁজ নিয়ে দেখিও যে, জেলখানায়আমি যখন জেলে ছিলাম তখন নাচ, গান, অভিনয় তেমন ছিল না। পাঠ এবং সাহিত্য রচনার ভালো প্রভাব ছিল। বর্তমানে পাঠক সংখ্যা কমে গেছে।

আরও একটি বিষয় বলে রাখা দরকার সেটা হচ্ছে যে, জেলখানার ভিতরে মানুষের দৈহিক চাহিদা রয়েছে সেটা কিন্তু অপূর্ণনই থেকে যায়। হয়তো খাওয়া দাওয়া, ঘুম পূরণ হয়। কিন্তু কারা অভ্যন্তরে প্রাপ্তবয়স্ক একজন নারী বা পুরুষের শারীরিক চাহিদা থাকে সেটা কিন্তু আর পূরণ হয় না। সে তখন অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়ে তার জীবন পার করে। এই চাহিদা হ্রাস করার জন্য জেল কর্তৃপক্ষ প্রচুর পরিমাণে তেঁতুল খাওয়াতো। তেঁতুল খাওয়া ছিল বাধ্যতামূলক। ভাত, রুটি যেটাই খেতাম না কেন তার সাথে তেঁতুল থাকত। বাংলাদেশের কারাগারে এই চাহিদা পূরণের নূন্যতম কোনো ব্যবস্থা নেই। যে কারণে কারা অভ্যন্তরে সমকামীতার একটা প্রভাব তখনও ছিল। বাংলাদেশ সরকারের এই সমস্যা নিরসনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। উন্নত বিশ্বে অনেক দেশেই কারাগারে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে স্বামী স্ত্রী বা পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে সহবাস করার রীতি রয়েছে। সেখানে কারাগার বা শোধনাগারে সন্তান জন্মদান প্রক্রিয়া অভ্যাহত রয়েছে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ সম্প্রতি ভারতেও এই ধরনের ব্যবস্থাপনার খবর শোনা যায়। বাংলাদেশের পক্ষে এটা বাস্তবায়ন করা হয়তোবা কঠিন। এরকম আইন করা হলে বাংলাদেশের লোকজন সেটা হয়তো মেনে নেবে না। ধর্মীয় আইনের প্রাধান্য দিয়ে যৌক্তিতা বিশ্লেষনের মাধ্যমে সীমিত পরিসরে এই সকল সমস্যা সমাধান করা উচিত। আমি তো আর আইন

প্রণেতা না। তবে আমার কাছে মনে হয় সীমিত পরিসরে বিশেষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দুই মাস তিন মাস অন্তর স্বামী স্ত্রীর সহবাসের ব্যবস্থা করা উচিত। একজন অপরাধীকে সংশোধনের জন্য যা যা করা দরকার ততটুকু তার অধিকার। ততটুকু না দিতে পারলেও অন্তত সীমিত পরিসরে হলেও সেসব ব্যবস্থা জেলখানার ভিতরে থাকা দরকার। যেমন একজনকে আমি যদি অপরাধী হিসেবে বিবেচনা করেই তাকে সংশোধনের ব্যবস্থা না করে যদি তাকে শাস্তি দিই তাহলে তার আর সংশোধন হবে না। এজন্য তাকে সংসারের ফিরিয়ে আনার জন্য তার মানসিক যেসব সুযোগ-সুবিধা দরকার সেসকল সুযোগ-সুবিধা তাকে দিতে হবে। দেওয়া খেলে সে অবশ্যই সংশোধন হবে বলে আমি মনে করি।

আমি জেলে যাই ১৯৭৫ সালের মার্চ মাসে। সেই সময়টা ছিল দেশের জন্য ক্রান্তিকাল। আমি মোট ২৭ মাসের মতো জেলে ছিলাম। ঐ সময়টায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভিন্ন ভিন্ন দোলাচলে মোড় নিচ্ছিল। ওই সময় পুরোটাই ছিল একদম টাইট। ওই সময়কার পরিস্থিতি এমন ছিল যে, স্কুল, কলেজে পিটি প্যারেড, জাতীয় সঙ্গীত, সব ধরনের সাংস্কৃতিক চর্চা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কোনো কারণে কোনো কিছু একটা ঘটলে কিংবা অন্যান্য জেলায় কোন কিছু একটা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গেই ঢাকার খবর পেয়েযেতাম। এইসব ঘটনার প্রেক্ষিতে জেলখানা ছিল অত্যন্ত কঠিন। এমন একটা ঘটনা আমি বলি। শোন, আমরা হয়তোবা একদিন সকাল বেলায় সেন্ট্রি এসে ওয়ার্ডের গেটটা খুলে দিয়েছে। আমরা হয়তোবা বের হয়েছি। বের হওয়ার ৫ মিনিট হয় নাই আবার সেন্ট্রি এসে বলতেছে যে, তাড়াতাড়ি ওয়ার্ডে ঢুকে পরো। আমাদেরকে বাধ্য করেই ভিতরে ঢুকানো হতো। জেলখানায় সবসময় একটা ভীতিকর অবস্থা কাজ করতো। জেলখানার বেশিরভাগ আসামিরা ছিল রাজনৈতিক কারণে বন্দী। সবচেয়ে বেশি ছিল জাসদের নেতাকর্মীরা। তাই দেশের যে প্রান্তেই কিছু ঘটলেই আমরা রেডিওর মাধ্যমে শুনতে পেতাম। ওই সময়ে রেডিওর মাধ্যমে তো সবকিছু আমরা খবর আদান প্রদান করতাম এবং আমরা জানতে পারতাম।

খবর জানতে পারতাম দেশের কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে। এগুলো তখন রেডিওর মাধ্যমে জানা যেত। এরকমই একটা ঘটনা ঘটেছিল যেদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছিল। সেদিন একজন ওয়ার্ড সেন্ট্রির উদ্যোগে একটা রেডিও নিয়ে আনা হয় আমাদের ওয়ার্ডে। সেদিন জাতির পিতার মৃত্যুর সংবাদ আমরা রেডিওতেই শুনেছিলাম। রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগার রাত্রীকালীন গ্রাম্য গোয়ালঘরের মতো পরিবেশ নীরব হয়ে গিয়েছিল।

আমি ৭৫ সালের মার্চ মাসে আমি জেলে যাই এবং ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত জেলের মধ্যে ছিলাম অর্থাৎ প্রায় ২৭ মাসের মতো। সেটা শুরু করেছিলাম গাইবান্ধা জেলখানা থেকে। আমি যখন গাইবান্ধা সরকারি কলেজে চাকরী করতাম আমাকে ডিটেনশন অর্ডার করা হলো এবং শুধু আমাকেই না হাজার হাজার মানুষকে ডিটেনশন অর্ডার করা হয়েছে। ওই সময় বঙ্গবন্ধু বেঁচে ছিলেন। আওয়ামীলীগ ক্ষমতায়ও ছিলেন। কিন্তু অনেক আওয়ামীলীগ কর্মী গ্রেফতার হয়েছিলেন সেসময়। সকল রাজবন্দীদের রাখা হতো সাধারণ কয়েদিদের সাথে। এটা খুব বিব্রতকর অবস্থায়ও ছিল। তখন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ছিল বিপ্লবী দল। দাঙ্গা, হামলা, মিছিল, মিটিং, হরতাল অনবরত চলছিল। হাজার হাজার জাসদের কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়েছিল। প্রায় সব জেল গুলোই জাসদের নেতাকর্মীদের দিয়ে পরিপূর্ণ ছিল। আংশিক বিপ্লবী আওয়ামীলীগ নেতাকর্মীও গ্রেফতার হয়েছে। আমি জাসদ করতাম। নিয়মিত মিটিং মিছিলে উপস্থিত হতাম। তারপর বাকীসব নেতাকর্মীদের মতো আমিও চার দেয়ালে আবদ্ধ হলাম। কেটে গেছে তিনটি বছর। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর কর্নেল তাহের, আসম আব্দুর রউফসহ আরও অনেকেই আমার সাথে জেলে বন্দী ছিলেন।

কারাবন্দীর অভিজ্ঞতা- ১১

হুসাইন মিয়া নামে একজন রিকশাচালক ইয়াবা মামলায় কারাগারে ১৩ বছর কারাবন্দী ছিলেন। বন্দী থাকাকালীন তিনি বাবুর্চি ও ম্যাট হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন, এক বক্সে দশ

হাজার ইয়াবা থাকে এমন ২৫ বক্স ইয়াবা সহ টেকনাফ থেকে পুলিশ আমাকে ধগাড়ি সহ ধরে ফেলে। একের পর এক মোট ১৪টা মামলা হয় আমার নামে। প্রথমে তিন বছর আমি কক্সবাজার জেলে হাজতি হিসেবে ছিলাম। তারপর আমার ১০ বছরের সাজা হয়। সাজা হওয়ার পরে দুইবছর সাজা খেটেছেন কক্সবাজার কারাগারে। বাকি আট বছর সাজা খেটেছেন চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে।

কক্সবাজার কারাগারে আমার দায়িত্ব ছিল ম্যাট হিসেবে। যারা নতুন হাজতি আসতো তাদেরকে দেখাশোনা করা, সমস্যা সমাধান করা ইত্যাদি কাজ ছিলো। আমার একটা ওয়ার্ড এর দায়িত্ব ছিল। একটা ওয়ার্ডে ২০ দিনের দায়িত্ব থাকে। এরপরে আবার অন্য আরেকটা ওয়ার্ডের দায়িত্ব পালন করতে হতো। যখন ম্যাট ছিলাম তখনও বেশ টাকা ইনকাম করেছি। গরু আসলে তাকে কেনার জন্য সবাই জেলার কে টাকা দিতাম। গরু বলতে নতুন হাজতিকে বোঝাচ্ছি। আমরা যারা জেলে থাকি বা জেলের ভেতরে যারা কয়েদি ছিলাম তারা নতুন হাজতিদেরকে বলতাম গরু। আমরা জেলারকে এক-দেড়হাজার করে টাকা দিয়ে চেহারা দেখে গরু কিনে নিতাম। যে গরুর চেহারা যতো ভালো সে গরুর দাম ততো বেশি। যে কিনে নিবে সে ঐ গরুকে তার ওয়ার্ডে নিয়ে যাবে। তাঁর আচার-ব্যবহার, তার পোষাক আশাক দেখে তার দর যাচাই করে নিতাম। যদি কারো চেহারা ভালো, জামাকাপড় ভালো, আচার-ব্যবহার ভালো দেখি তাহলে তার দাম বেশি। ঐ হাজতিকে আমরা অমানুষিক নির্যাতন করতাম। প্রথমে তাকে দিয়ে বাথরুম পরিষ্কার, ড্রেন পরিষ্কার, রুম পরিষ্কার করাই। তাকে শোয়ার জন্য জায়গা দিতাম না। একটা পর্যায়ে তাকে বলতাম তুমি কিছু টাকা দিলে তোমাকে আর এতো কষ্ট করতে হবে না। তার কাছে ৩০/৪০ হাজার টাকা দাবি করতাম। সে আমাদেরকে টাকা দিতে বাধ্য হতো। যদি দশ হাজার টাকা দিতে চায় তাহলে তাকে আরো বেশি করে নির্যাতন করতাম। যাতে সে টাকা বাড়িয়ে দেয়। তিন-চারদিনের মধ্যে টাকা দিতে শিকার হয়ে যায়। ওখানে একজন নতুন হাজতি সে টাকা দিতে বাধ্য হয়, কারণ তাকে যে পরিমাণ নির্যাতন

করা হয় সে নির্যাতন সে সহ্য করতে পারবেনা যার ফলে তাকে অতিরিক্ত অর্থ দণ্ড যায়। যখন সে সম্পূর্ণ টাকা দিতে রাজি হবে তখন তাকে আমরা আপ্যায়ন করতাম। আপ্যায়ন বলতে ধরুন তাকে আমরা ভালো ভালো খাবার দিতাম, অন্যান্য হাজতিদের মতো তাকে খাওয়াতাম না, তাকে মাছ-মাংস বেশি করে দিতাম। অন্যদের মতো তাকে আর কষ্ট করতে হবে না। তাকে ফাইলে থাকতে হবেনা। তাকে সেবা করার জন্য একজন মানুষ দেওয়া হবে। আমার সাজাকালীন সময়ে দুই বছর ম্যাটের দায়িত্ব পালন করার পরে আমাকে দেয়া হয় ভাত রান্না করার দায়িত্বে। তার মানে আমাকে বাবুর্চির দায়িত্ব দেয়া হয়। কক্সবাজার কারাগারে ছিলাম মোট ৭ বছর। বাকি সময় কাটাই চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে। সেখানেও আমি ম্যাটের দায়িত্ব পালন করেছি। আমার ওয়ার্ড ছিলো মেঘনা ১০। প্রত্যেক কয়েদিকে যেকোনো একটি দায়িত্ব পালন করতে হয় যেমন : কাউকে ম্যাটের দায়িত্ব, রান্না করতে হয়, বাগান পরিষ্কার করতে হয়, ক্ষেত-খামারের কাজ করতে হয়, সেলাই কাজ করতে হয়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাজ করতে হয়, বিনোদন দেওয়ার দায়িত্ব, সুইপারের কাজ করতে হয়। ওয়ার্ডের মধ্যে কেউ আমার কথার একবিন্দু এদিসেদিক হতে পারবেনা। কেউ যদি কথা না শুনে মানে ওয়ার্ডে ঝামেলা করে তাহলে আমি লিখে জমাদারকে দিয়ে দিলে জমাদার তাকে ডেকে ধলাই দিবে। জমাদার সরকারি কর্মকর্তা এখন আর আগের মতো বেড়ি নাই, মার নাই, কঠিনশাস্তি নাই। এখন কেউ কথা নাশুনলে তাকে ওয়ার্ড পরিবর্তন করে দেয়। ওয়ার্ডের মধ্যে এক জন বন্দীর জন্য ১৮ ইঞ্চি জায়গা বরাদ্দ। আমাদের দেশের জেলখানা করেছে বাহিরের দেশের লোক। তারা তাদের চিন্তা মতো করে গেছে। একটা ওয়ার্ডের ৩০ থেকে ৪০ জন থাকতে পারবে এমন কক্ষ কিন্তু আমাদের দেশে আসামী বেশি সে জন্য একটা ওয়ার্ডের বা কক্ষে ২৫০ জন পর্যন্ত থাকতে হয়। লকডাউনে আসামী জামিন দেয়নি যার ফলে অতিরিক্ত আসামী বেড়ে যায়। খাবারের কথা বললে সকালে একটা রুটি অল্প সবজি দেওয়া হয়, আগে গুড় দিতো এখন সবজি দেয়। সপ্তাহে চার দিন দুপুরে মাছ এবং একদিন

মুরগির মাংস। মাসে একবার গরুর গোস্ত। সন্ধ্যায় জমাদার গোনার পরে রাতের খাবার দিয়ে দেয়। কক্সবাজারের কারাগারে জমাদার গোনার পরেই রাতে খেয়ে ফেলতে হয়। কিন্তু চট্টগ্রামে জমাদার গোনার পরেই রাতে খাবার দিয়ে দেয় বন্দীরা ইচ্ছে মতো সময়ে খেতে পারে। যদি কোনো বন্দী মারা মারি বা ঝগড়া করে তাহলেম ম্যাট গিয়ে জমাদারকে বলবে। জমাদার তাকে ক্যাস টেবিলে দিবে সকালে তার বিচার হবে। আগে বেড়ি দিতো, টর্চার করতো, সেলে দিতো। সেল খুব কষ্টের জায়গা আলো নাই, দিন এবং রাতের পার্থক্য বোঝা যায়না, ফ্যান নাই, বেড নাই, অতিরিক্ত মশা। প্রত্যেকটা ওয়ার্ড এর মধ্যে কক্সবাজার কারাগারে দুইটা করে ল্যাট্রিন আছে কিন্তু চট্টগ্রাম কারাগারে তিনটা লেট্রিন আছে। এর মধ্যে গোসল, পায়খানা, প্রসাব সবকিছুই করতে পারে। তুলনামূলক উচ্চতা একটু কম দাঁড়ালে দেখা যায়। একটা পর্দা ব্যবহার করে। কারাগারের ভেতরে একটা লাল বাহিনী এবং একটা কালো বাহিনী আছে যারা লাল বাহিনী তাদের দায়িত্ব হলো ফুলগাছে পানি দেওয়া, ফ্লোর এবং সিঁড়ি পরিষ্কার করা আর কালো বাহিনীর দায়িত্ব হলো লেট্রিন এবং ড্রেন এগুলো পরিষ্কার করা। এরা প্রত্যেকেই হাজতি। এগুলা দেখাশুনা করে একজন হাজতি। ওয়ার্ডের মধ্যে সবাই মিলে একজন চেয়ারম্যান নির্বাচন করে। তার দায়িত্ব এগুলা দেখাশুনা করা। খাওয়ার আনাও তার দায়িত্ব। এর জন্য প্রত্যেক হাজতি তাকে সপ্তাহে এক বান্ডেল করে আকিজ বিড়ি দেবে। ওখানে ইয়াবা, গাজা সব পাওয়া যায়। একটা ইয়াবার দাম ৩০০ টাকা।

বন্দীদের জন্য বিনোদনের কোনো ব্যাবস্থা আছে কিনা– এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি আরও জানান, বিনোদনের জন্য টিম আছে। প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে গিয়ে তারা গান করে, আনন্দ করে। এবং মাঠের মধ্যে বসে করতে পারে। এই টিমটার মধ্যে সদস্য সংখ্যা যদি থাকে ৪ জন তাহলে যে ওয়ার্ডে যাবে সেখান থেকে আরো কিছু মানুষ ম্যানেজ করে তারা অনুষ্ঠান করে। যারা এই টিমের সাথে যুক্ত তারা প্রতিদিন এককেটা ওয়ার্ডে গিয়ে অনুষ্ঠান

করে। এই টিমটা একের পর এক ওয়ার্ড ঘুরতে থাকে। বন্দীদের জন্য বিনোদন প্রোগ্রাম করতে হবে। গানের অনুষ্ঠান করলে মানুষ বেশি পছন্দ করে। এমন ধরনের অনুষ্ঠান করলে বন্দীরা মানসিকভাবে সুস্থ থাকবে, আনন্দে থাকবে, দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি পাবে আমি মনে করি এই ধরনের প্রোগ্রাম বেশিবেশি করে থাকা দরকার। অনেক বন্দী আছে যারা নিজেদের ভেতরে ঝগড়া বিবাদ করে, তাহলে যদি এমন প্রোগ্রাম বেশি হয় তাহলে এই মারামারি গুলো একটু কমবে। যৌতুক বিরোধী নাটক করতে হবে, শিশুনির্যাতন, অপহরণ, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, এসিড নিক্ষেপ, নারী নির্যাতন, সন্তানের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে এই ধরণের সচেতনমূলক নাটক তৈরি করতে হবে তাহলে ওদের ভেতরে মানসিক বিকাশ ঘটবে। সংস্কৃতির চর্চা করলে বন্দীদের কী উপকার হবে-এর প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, প্রথমত মানসিক দুশ্চিন্তা কমে। সারাক্ষণ যদি একজন মানুষ চিন্তা করতে থাকে, চেহারা অন্ধকার করে থাকে, তাহলে সে বড় ধরনের রোগে পড়তে পারে, যদি একটু হাসিখুশি থাকা যায় তাহলে মানসিকভাবে সুস্থথাকবে। আমরা অনেক বন্দীকে দেখেছি চেহারা অন্ধকার করে থাকে, এক কোনায় বসে থাকে এবং বসে বসে সারাক্ষণ কান্নাকাটি করতে থাকে, তাদেরকে আমরা বোঝাই কিন্তু বোঝানোর থেকে ও যদি বিনোদনের ব্যবস্থা থাকে তাহলে তাদের জন্য আরো বেশি ফলপ্রসূ হবে।

নিজ পরিবারের কথা জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমার ছোট বেলায় বিয়ে হয়। আমার বয়স যখন ১৫ বছর তখন আমি বিয়ে করি। আমার দুইটা ছেলে একটা মেয়ে। বড় মেয়ে বিয়ে দিয়েছি, বড় ছেলে মেট্রিক পাশ করেছে, ছোট ছেলেও মেট্রিক পাশ করেছে পড়াশোনা করছে। আমি আরেকটা বিয়ে করি, আমি জেলে যাওয়ার পরে আমাকে কেউ দেখতে যায়নি। আমার সন্তানরা দেখতে যায়নি আমার ছোটবউ আমাকে ডিভোর্স দিয়ে আবার বিয়ে করে। আমার ২৫ লক্ষ টাকার সম্পত্তি বিক্রি করে দেয়। যার ফলে আমি জেল থেকে বেরোনোর পরে

একটা রিক্সা ভাড়া নিয়ে এখানে থাকি, এখানে খাই। বাড়ি যায়নি কোনদিন, আমার বড়ছেলে সবে বরাতের দিন ফোন করেছিল যাওয়ার জন্য আমি টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি কিন্তু আমি যাইনি।

কারাবন্দীর অভিজ্ঞতা- ১২

আলম শাহ নামে ২৫ বছর বয়সী এক শিক্ষিত যুবক ইয়াবা ও অস্ত্রমামলায় প্রায় ৮ মাস জেল খেটেছে এবং অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে। তিনি একটা TDH নামে বিদেশী সংস্থার সাথে এনিমেটর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর বয়ানে জানান, রাতে আমি কম্পিউটারের কাজ করতাম। কিছু কিতাব (বই) বানাতো। মায়ানমারে কিছু নতুন কারিকুলাম আপডেট হয়েছে। কম্পিউটার থেকে ডাউনলড করে আমি প্রিন্ট করতাম। ক্যাম্পের বিভিন্ন স্কুলে পৌঁছিয়ে দিতাম। এবং আমি শিশুদের শিক্ষা দিতাম। কুতুপালং বাজারে যাই অফসেট পেপার কেনার জন্য কিন্তু দাম কক্সবাজারে তুলনায় প্রতিবার প্যাকেটে ৩০ থেকে ৪০ টাকা করে বেশি। যার ফলে আমি কক্সবাজারে গিয়ে সাড়ে তিন হাজার প্যাকেট অফসেট পেপার কিনে সিএনজিতে করে নিয়ে আসি। যেদিন আমি কিনে নিয়ে আসি সেই দিন রাতে ১২টার দিকে আমার খুব মাথাব্যাথে করছে। আমার স্ত্রী বললাম তুমি একটু কিতাবগুলা সিরিয়াল করে দাও। সাড়ে তিনশত সাত কিতাব প্রিন্ট করেছে মানে ৩৫৭ টা কিতাব প্রিন্ট হয়েছে। আমাদের রোহিঙ্গাদের কিছু স্কুল আছে স্কুল গুলোর নাম নিউ মন, নিউ লার্নিং সেন্টার ইত্যাদি এই ধরনের সেন্টার গুলোতে আমি প্রতিদিন সকালে এই বইগুলো সাপ্লাই দিতাম। এখানে ক্লাস বাই ক্লাস পড়া লেখা শেখানো হয়। যত গুলা লার্নিং সেন্টার আছে সব সেন্টারে আমার বই পড়ানো হয়। ওই দিন রাত্রে বারোটার দিকে হঠাৎ করে দেখি চারিদিকে লাইট দরজায় ধাম ধাম লাথি মারছে। আমার স্ত্রী আমার মাথায় হাত দিয়ে ডাকছে বলছে ঘরের দরজায় কে যেন লাথি মারছে তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম কে? দরজার ওপাশ থেকে বলছে আমরা পুলিশ দরজা খুল। আমি বললাম খুলছি স্যার। ঘরে ঢুলেই আমার ৩টা আলমারি ভেঙে ফেলে।

বলছে ট্যাবলেট (ইয়াবা) কোথায়? স্যার এসব ফেক নিউজ, আমি ওসব করিনা। তুই ডবলুকেট ডেটা কার্ড বানিয়ে ডাবলুকেট মানুষকে রেশন খাওয়াস। তুই দুই নাম্বারি কাজের সাথে জড়িত। আমি বার্মার বই গুলা ওয়েবসাইড থেকে চুরি করে আমরা শিক্ষকরা মিলে বই প্রিন্ট করি। তখন ওরা বলে এগুলা সব প্যাক কর: কম্পিউটার ৪টি, ল্যাপ্টপ ৪টি, মোবাইল ৪টি, প্রিন্টার ৪টি, কাটার মেশিন ৪টি, ব্যাটারি ৩টি, ৩০০ ওয়ার্ডের ৪টি সোলার ছিল, ২টি জেনারেটর, সাদা কালো ফটোকপি মেশিন ১টি। আমার স্ত্রী একটা ল্যাপটপ তার পাছার তলে লুকিয়ে রাখে একজন পুলিশ আমার হামিলবতি (গর্ভধারিণী) স্ত্রীর পেটে লাথিমারে। কিছুক্ষনের মধ্যে রক্তে ভেসে যায়। ৩৫৫৭টি বই প্রিন্ট করা ছিলো ১০০ বইয়ের দাম ১৭০০ টাকা। আমি বিক্রি করলে প্রতিটা বইয়ে ১০/১২ টাকা লাভ থাকে। ব্লক থেকে মানুষ ডেকে তাদের দিয়ে দেয়। এরপরে ৩৫০ বান্ডিল অন্সেট পেপার ছিলো সব ওরা নিয়ে বলে চল। আমাকে হ্যানকাপ পরিয়ে নিয়ে যায়। মধুর ছড়া পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে যায়। আমার সম্পূর্ণ শরীর কয়েক দফায় চেক করে কিছু না পাওয়ায় ওরা আমাকে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরের ভিতরে নিয়ে যায়। সেখানে বেতের লাঠি দিয়ে পেটাতে থাকে তারপর একটা সময় আমি বললাম ভাই আপনারা যেটা বলে আমি সেটাই করেছি। লিখেছে আমার ঘরে তিনটা অস্ত্র পেয়েছে, দুইজন লোক পালিয়ে গেছে, ডাটা কার্ড (রিফিউজি কার্ড) কপি করে খারা মানুষদের সাপ্লাই দেই এবং ১০ হাজার পিস ইয়াবা ট্যাবলেট পাওয়া গেছে। এভাবে একটি ফাইল আমার নামে তৈরি করে। আমার সামনে একটি টেবিলের উপরে দুইটা বন্দুক এবং দুই হাজার পিস ইয়াবা ট্যাবলেট দিয়ে একটি ছবি তোলে। তারপর আমাকে উখিয়ে থানায় নিয়ে যায়। আমাকে রিমান্ডে দেয় স্বীকার করানোর জন্য। আমার মাথায় ইলেকট্রিক শর্ট দেওয়া হয়। আমি জেলে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। আমাকে জেলে প্রথমে হাস্পাতালে রাখে।

জেলের অভিজ্ঞতা বিষয়ে তিনি আরও বলেন, ৫০০০ টাকা দিয়ে ওয়ার্ডে নেয়। আমি বাকখালি-২ জেলে ছিলাম। আমাদের রোহিঙ্গাদের জন্য আলাদা জেল আছে ২টা নাম বাকখালি-১, বাকখালি-২ এখানে শুধু রোহিঙ্গারাই থাকে। আমি একমাত্র রোহিঙ্গাদের মধ্যে সিট কিনে নিয়েছিলাম। প্রথমে ৫ হাজার টাকা, তার পরে প্রতি মাসে ২ জাহার করে দিতাম। ফজর নামাজের পরপরই একজন গুন্তি আসবে সে সবাইকে বসিয়ে গুনে ফেলবে। সকালে একটা রুটি অল্প সবজি দিবে। সবজি খুব তিতা লাগে খাওয়া যায়না। রুটি খেলে গা চুল্কায়। যাদের টাকা আছে তারা আবার হোটেলে নাস্তা করতে পারে। গোসলের কোনো সময় সিমা নাই। যখন লাইনে পানি আসবে তখন গোসল করবে। তবে বেশির ভাগ সময় সকালে পানি আসে। ১২ টার দিকে আবার ফাইলে বসতে হয় গুন্তি এসে গুনে যাবে। এখানে খুব কষ্টের জীবন। আমি যে সেলে থাকতাম এই রুমটা ১০ হাত বাই ৩০ দাত হবে। আমরা প্রায় ২৩০ জন থাকতাম সেই রুমে। এক এক জনে জন্য ১ ফুট করে জায়গা পায়। এক কথা হয়ে ঘুমাতে হয়। বেশির ভাগ বসে থাকে। আমি নাস্তা করার পরে সেলের বাহিরে ঘোরাঘুরি করতাম বাগান দেখাশুনা করতাম। একটা নিদ্রিষ্ট স্থান পর্যন্ত যেতে পারে সিমানার বাহিরে গেলে মারধর করে। দুপুরে ভাত এবং সবজি দেয়, আর মাছ রবিবার বুধবার মাছ দেয়। রাতে ভাত মাছ। চাইলে সিগারেটের বিনিময়ে ভাত, তরকারি মাংস সব পাওা যায়। দুপুরে খাওয়ার পরে ঘন্টায় বাড়ি দেয় তখন সবাই বের হতে পারে ক্যান্টিন থেকে চা নাস্তা খেতে পারে এককাপ চা ১০ টাকা। হোটেলে একটা সবজি ৫০ টাকা, মাছ ১০০ টাকা। বিকেল ৪.৩০ মিনিটে ঘন্টা দিয়ে দিবে তখন সেলে তালা মেরে দিবে। ভেতরে কোনো কাজ নাই। শুয়ে থাকে, বসে থাকা, হান্ড্রেট খেলা, জুয়া খেলা, জেলের ভেতরে টাকা থাকলে দুনিয়ার সব পাওয়া যায় যা বাহিরে নাই তা জেলে আছে। জেলের ভিতর খারাপ অভিজ্ঞতার কথা বলতে গেলে- যাচাই বাছাই ছাড়াই মারে, হাস্পাতালে ভালো চিকিৎসা নাই, ডাক্তার নাই, চুলকানি রোগ বেশি, উকিলে ঘুরায়। কারাগারের সেনিটেশন ব্যাবস্থপনা এক কথায় খুব খারাপ অবস্থা। আমাদের

২৩০ জনের জন্য মাত্র ২টা ল্যাট্রিন সবাইকে লাইন ধরতে হয়। পর্যাপ্ত পানি থাকে না। প্রস্রাবের থলি বড় হয়ে যায়। এত বেশি গন্ধ, এককাত হয়ে থাকলে শরীরে ঐস্থানে চর্ম রোগ হয়।

কারাগারে বিনোদনের জন্য আমরা নিজেরা নিজেরা গান করতাম, যদি একটি শব্দ বেশি হয় ইয়াহলে মারে। এটা টিভি আছে শুধু সংবাদ শোনা যায়। আর যদি মন চায় কয়েদিরা ঢোল বাজনা নিয়ে আসে ৫/১০ মিনিট গান করে চলে যায়। এই ছাড়া আর কিছু হয় না। আমার নিজের আকাআকি, গল্প, কবিতা, গান, আমার নাটক করতে মনচায়। আমি অনেক গুলা গল্প লিখেছি ২ টা গল্প নাটক করা হয়েছে। কিছু কাজ করতে মন চায় কিন্তু ভয় লাগে।

জেল পূর্ববর্তি পেশা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, অনেক ইন্টার্ভিউ দিয়েছি চাকরি হয়ে যাবে যাবে এমন সময় আর হয়না। খুব অভাবে আছি। মাঝে মাঝে ডাকাতি করতে মন চায়। খারাপ লোকদের সাথে নাম লেখাতে মন চায়।

তাছাড়াও অন্যান্য কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন;

- আমাকে এখন সবাই প্রায় বলে সে একজন মাস্টার/টিচার ছিলো সে এমন কাজ করলো।
- এখন আর কেউ আমার কাছে পড়তে আসে না।
- আমার জেল থেকে বের হতে প্রায় ২লাখ ৬০ হাজার টাকা লেগেছে। বর্তমানে অনেক টাকা ঋণী আছি আমি।
- ইন্টার্ভিউ দিলে জব হয়না।
- দোকান দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু সবাই বলে বাহিরে থাকবে দোকানের মাল ভেতরে থাকবে অস্ত্র।
- টাকা পয়সার জন্য অনেক সময় পালিয়ে থাকি, মাঝে মধ্যে গ্রামে চলে যাই।
- পড়া লেখা জানি সেজন্য যেকোনো কাজ করতে লজ্জা লাগে।

- আমার কম্পিউটার দোকান ছিলো, বউয়ের ১০ ভরি স্বর্ণ বিক্রি করেছি। আমি এখন একদম শেষ হয়ে গেছি। খুব অসহায় দিন পার করি।

কারাবন্দীর অভিজ্ঞতা- ১৩

স্বপন ব্যানার্জি নামে একজন শিক্ষক ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত থাকার দরুন মাত্র ৫ দিনের জন্য জেল খাটেন। তিনি ভিন্ন আঙ্গিকের তথ্য দেন। তিনি জানান, জেলের জীবন আমার ক্ষেত্রে একটু ভিন্ন ছিলো কারণ আমি জেলে যাচ্ছি ভেতরে আগে থেকে ম্যাট জেনে যায়। আমাদের লিডার জানিয়েছিলো। আমার জন্য সব সময় সব কিছু রেডি থাকতো। যেমন গোসলের সময় ২ জন আমার জন্য রেডি থাকত পানি ঢালার জন্য। আমি মানা করলেও আমার কথা মানে না। কারণ তাদেরকে ম্যাট বলে দিয়েছে তাদের প্রতিদিনের কাজ এটা। অন্য দিকে খাওয়ার ব্যাপারে সবার জন্য একবাটি ভাত, অল্প সবজি। আমার জন্য ভিন্ন ছিলো। হাজতিদের জন্য একরকম রান্না হতো ম্যাটদের জন্য আলাদা রান্না হতো। আমি গেলে ম্যাটদের ওখান থেকে আমাকে আপ্যায়ন করতো। ওখানে একটা জিনিসের খুব দাম সেটা হলো সিগারেট। আমি ওদেরকে অনেক সিগারেট যোগান দিতাম। আমার সাথে যারা দেখা করতে যেতো সবাই সিগারেট নিয়ে যেতো। জেলে কিন্তু সিট কিনতে হয়। ধরুন শোয়ার জন্য সিট ভাড়া ২০ হাজার টাকা, অর্ধেক শোয়ার জন্য ৫ হাজার টাকা এবং যাদের টাকা নাই তারা শুধু বসতে পারবে। ওখানে সবচেয়ে কষ্টের বিষয় ছিলো বাথরুমের। ১২০ জনের ওয়ার্ডে মাত্র একটা ল্যাট্রিন। লেট্রিনে বসলে কাঁধের ওপর থেকে দেখা যায়। এবং পর্যাপ্ত পানি থাকে না। সকালে গোনার পরে সবাইকে হাটাহাটি করার জন্য সুযোগ আছে। কিন্তু প্রত্যেক ওয়ার্ডের জন্য নির্দিষ্ট সীমানা রয়েছে। মাঠে একটা দাগ দেওয়া থাকে, সেই দাগ অতিক্রম করলে পুলিশে বাশি দেয়। না মানলে লাঠি চার্জ। কেউ যদি নিয়ম অমান্য করে তাহলে তাকে বেড়ি পরিয়ে দেয়। সারা দিন হাজতিরা বসে বসে হান্ড্রেড খেলে, সন্ধায় একটু খবর দেখে।

রাতে একটানা ঘুমানোর উপায় নাই কারণ ২ ঘন্টা পর পর গুন্তি আসে। সে আসলেই লাথি মেরে, ধাক্কা মেরে সবাইকে তুলে দেয়। আবার কিছুক্ষন পরপর আজান দেয়। শান্তিমতো ঘুমানোর উপায়ও নাই।

কারাগারের অভ্যন্তরে কালচারাল প্রোগ্রামের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে চাইলে বলেন, ওখানে হয়রানীর শেষ নেই, অশান্তির শেষ নেই, টিভি একটা আছে সেটা ঠিকঠাক চলেনা। আর মানুষের বসার জায়গা নাই সেখানে সাংস্কৃতিক চর্চা ভাবা যায়না। সীমাহীন কষ্ট আর অসম্ভব দুর্ভোগের শিকার হতে হয়। তবে ম্যাট যদি বলে রহিম একটা গান কর বা হুজুর একটা ইসলামি সংগীত গাও। তাহলে হয়, না হলে নাই।

কারাবন্দীর অভিজ্ঞতা- ১৪

কারাগারের সাবেকী ব্যবস্থা প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কুড়িগ্রাম জেলার কারাগারের বন্দী আজাদ মুক্তার (ছদ্মনাম) বলেন, জেলখানার নিয়ম কানুন গুলো একেবারে ব্রিটিশ আমলের মত। একজন ডেপুটি জেলার সামনে কেস টেবিলের সামনে গিয়ে বসতে হবে জড়োসড় হয়ে আপনি যত বড় লিডারই হোন না কেন বা যতই শিক্ষিত হোন। মাথায় হাত দিয়েস্যান্ডেল ধরে রেখে হাঁটু গেড়ে এবং প্রয়োজনে জড়োসড়ো হয়ে তার সামনে গিয়ে বসতে হবেএবং যখন আপনার নাম ডাকবে তখন আপনাকে স্যালুট করতে হবে। চারজন চারজন করে লম্বা সময় নিয়ে কেস টেবিল অনুষ্ঠিত হয়। মামলা ও সবকিছুর ডিটেলস দিয়ে আলাদা আলাদা ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দিত। আমরাযেইওয়ার্ডে ছিলাম সেখানে প্রচন্ড গরম ছিল। জেলখানার ভিতরে কোন ফ্যান ছিল না। এটা খুবই নির্যাতনমূলক দিন ছিল আমাদের জীবনের জন্য। জেলখানায় নিয়ে যাওয়ার পরে আমাদেরকে একটা করেথালা, গ্লাস এবং বাটি দেয়। এগুলো এতোই পাতলা ছিল হাত দিয়ে একটু জড়ে টোকা দিলেই ভেঙ্গে যাবে। তাছাড়া আমাদেরকে আলাদা আলাদা করে রাখেনি, একসঙ্গে রাখা হয়েছিল এইটাই একমাত্র স্বস্তির বিষয় ছিল। রুমের

লাইট এতই পাওয়ারফুল ছিল যে লাইট সব সময় জ্বালানো থাকত, কখনো নিভাতে দিত না। এতে খুব গরম আর ঘুমাতে কষ্ট লাগত। টয়লেট ছিল এর ভিতরে একটি কোনায়, চট দিয়ে একটু ঘেরা। এমন একটা অবস্থা ছিল পরিস্থিতি ছিল যে দুই পাশে তিনটা তিনটা করে ইট দেওয়া এবং ওইটার উপরে আপনাকে প্রস্রাব-পায়খানা করতে হবে। জেলখানার ভিতরে যেহেতু গ্রিল ছিল এজন্য জানালা সব সময় খোলা থাকতো এবং সব সময় লাইট তার অনেক কারণ ছিল রাতের অন্ধকারে ব্রিটিশ আমলে রাতের অন্ধকারে কম্বল দিয়ে আত্মহত্যা করত কিংবা কেউ একজন আরেকজনকে খুন করে ফেলতো। এরকম একটা ঘটনা রাজশাহী জেলে অঞ্চলে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। তাই লাইট জ্বললে বাইরে থেকে আসামিদেরকে সহজেই দেখতে পাওয়া যায়। তারা এসে চেক করে এবং গণনা করে দেখে ঠিকঠাক আছে কিনা লাইট যদি বন্ধ থাকে তাহলে বন্দীদের গণনা করা যাবে না এবং দেখাও যাবে না। একদিকে পাওয়ারফুল লাইট সবসময় জ্বালানো থাকে অন্যদিকে প্রকৃতির গরম অন্যদিকে গরমের মধ্যে থাকা আমাদের জন্য খুবই কষ্টকর একটা ব্যাপার ছিল। আমাদের একজনের পায়খানা করতে যায় তখন বাকিরা নাক মুখ ঢেকে বসে থাকতে হয়। এরপরে যখন দশটা বাজে তখন বলে পায়খানাটা কাউকে নিয়ে যেতে হয়, ওই সময় যে দুর্গন্ধটা! এটা আসলে অনেক কষ্টকর!

সকালে নাস্তায় রুটি দেয় আছে রুটির উপরে তো ঠিক ভালোই থাকে কিন্তু নিচে ইটের গুড়া ময়লা চুল ইত্যাদি লেগে থাকে খাওয়া যায় না। আবার এই সব খাবার খেয়ে বেশির ভাগ সময় দেখা গেছে আমাদের পেটে নানা ধরনের অসুখ বিসুখ হয়ে যেত। পায়খানায় যেতে অবস্থা খারাপ হয়ে যেত, ঐ দিকে সীমিত পরিমাণ পানি দিয়েই সব কাজ করতে হত। দুপুরে যে খাবার দিত তাতে তো কোনো ধরনের জীবন বাঁচিয়ে রাখার জন্য খাওয়া আর কি। যে ডাল দিত তাতে দেখা গেছে নদীর জল বরাবর।

কারাবন্দীর অভিজ্ঞতা- ১৫

কারাগারে বন্দীদের বিনোদন সুবিধা প্রসঙ্গে হতাশা প্রকাশ করে কারাবন্দী ইবাদুল হক (ছদ্মনাম) বলেন, কুড়িগ্রাম জেলে এসে দেখলাম যে অবস্থা আরো খারাপ এবং একই রুমে আমরা চোর বাটপার থেকে শুরু করে সবাই এক রুমের ভিতরেই ছিলাম। যদিও আমাদের পরের দিন হয়ে গেছিল। আমরা যখন ভিতরে ঢুকলাম দেখেছিলাম যে একজন গান গাইছিল'...শাওন রাতে যদি স্মরণে পরে...'। আমরা গুনগুন করে গান বলতাম এবং থালা বাসন বাজাতাম, ঐ সময় যেখানে জীবন টেকানো দায় সেখানে গান বাজনা, বিনোদন কল্পনাও করা যায় না। সার্বিকভাবে এখন যেটা বোঝা যায় যে, জেলখানা এখন এই সরকারের আমলে এসে অনেক পরিবর্তন হয়েছে এবং অনেক আপডেট হয়েছে; যেমন এখন টিভি দিয়েছে, লাইব্রেরি দিয়েছে। খেলাধুলার জায়গা করেছে এবং এখন মাঝে সাথে বিভিন্ন দিবসে প্রোগ্রাম হয় কালচার আর প্রোগ্রাম হয় যা আগে তুলনায় অনেক ভালো।

আমরা একদিন সবাই মিলে কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতা আমরা কোরাস আকারে গান বলা শুরু করলাম ২৮ জনের মত এবং এই গান বলা শুরু করার সাথে সাথে পুলিশ প্রশাসন এবং জেলখানাদের প্রশাসন ছিল তারা সবাই দৌড়ে এসে আমাদের কাছে অনুরোধ জানায়- "প্লিজ আপনারা এই গানটা বন্ধ করেন তাছাড়া সাধারণ কয়েদিরা যুক্ত হয়ে যাবে। জেলখানা ভাঙ্গা টাঙ্গা শুরু হয়ে যেতে পারে! প্লিজ আমাদের চাকরি বাঁচান! সবাই উত্তেজিত হয়ে যাবে এবং এটা একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে ভাই"। পরে আমরা এটা বন্ধ করে দিলাম। এছাড়া আছে মশার কষ্ট ছিল অনেক, মশার কামড়ে রাতে ঠিক মত রাতে ঘুমাতে আগুনের কয়লা নিয়ে এসে এসব ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ধোয়া দিত কিন্তু এসে কাজ হত না।

সবচাইতে দুঃখের বিষয় হচ্ছে জেলখানার ভিতরে যে আমরা থাকি একা সেটা কোন বিষয় নয় যদি খাবারটা ঠিক মত দিত। মোট কথা খাবারের কষ্ট, থাকার কষ্ট, শোবার কষ্ট, আচার আচরণের অনেক গাফিলতি,

আমাদের জন্য বরাদ্দ হওয়া জিনিস আমাদের যদি দিত, আমাদের কষ্টটা কম হত। অল্প একটু জায়গার মধ্যে গাদাগাদি করে গরমের মধ্যে এতগুলো মানুষ একসাথে থাকা, একই জায়গায় থাকা আবার সেইজায়গাতেই প্রস্রাব পায়খানা করা এর থেকে জঘন্য ও অমানবিক বেঁচে থাকা আর হয় না। এমন অবস্থার উদ্দেশ্য কেবল মনে একাটা কতগুলো মানুষকে বুঝে শুনে শাস্তি প্রদান করা ছাড়া আর কিছু নয়। তবে শুনেছি কারাগার নাকি এখন আর আগের মত নাই। তবে সেটা যারা এই সময় জীবন পার করছেন তারাই ভালো বলতে পারবেন যে, সেটা কতটুকু কারাগার নাকি মানুষ সঠিক পরিবেশে আনার স্থান।

কারাবন্দীর অভিজ্ঞতা- ১৬

আব্দুল রবি (ছদ্মনাম) তার কারাজীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে বলেন, আমরা যখন জেলখানায় যাই তখন আমাদেরকে বলা হয়েছিল যে- দ্রুত বের হয়ে যাবে কিন্তু দেখা গেল কলেজের আমার এক বড় ভাই অনেক চেষ্টা করেও জামিন করাতে পারছে না কিংবা পারেনি। যখন দেখলাম যে হচ্ছেনা, তখন সেই ভাই বলল যে, আজকে হবেনা কালকে রবিবার হবে। রবিবার যখন হচ্ছে তখন আমরা বুঝলাম যে না আসলে জামিন হতে মনে আমাদের দেরি হবে। দেরি হবে মনে আসলো তখনই আমরা আসলে ওই পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করতে থাকলাম যেহেতু আমরা এর আগে এরকম পরিবেশ ছিলাম না। জেলখানার ভিতরে পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়ানো ছাড়া আর কোন উপায় ছিলনা। এজন্য নিজেকে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করতাম। এরপরে দেখা গেল যে ওখানে আমরা ছিলাম প্রায় ২৩ জন। যে রুমে থাকার কথা ৫০ জন, সেই রুমে আমরা ছিলাম ৩০০জন। যে যেভাবে আছে সেভাবেই থাকতে হত কাত হওয়ার কোনো সুযোগ ছিলনা। ২০০১ সালে কথা এখন তো অনেক কিছুই আধুনিক হয়ে গেছে, পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু আমাদের সময়ে জেলখানার ভিতরে অনেক কষ্টে ছিলাম। কান্নাকাটি করার কোনো সুযোগ ছিল না, লজ্জায় হোক আর বিভিন্ন

পরিবেশের কারণেই হোক যেহেতু আমরা একটা ভালো রাজনৈতিক দলের কর্মী হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত। কান্নাকাটি করতে পারতাম না কারণ চক্ষু লজ্জা। আমরা যখন ওখানে খাওয়া দাওয়া করতাম তখন আসলে লাইন ধরে দাড়াতে হত সেটা কিন্তু আমাদের মানতে হত। তারপর আবার এক সঙ্গে বিকেল ৫টার দিকে সেলে চলে যেতে হতো। আমরা নিজেরাই জেলখানার ভিতরে যে দোকানের মত আছে সেখান থেকে চাল, ডাল এগুলো নিয়ে এসে রান্না করে খেতাম। প্রত্যেক সপ্তাহে সরকারের পক্ষ থেকে একটা চিঠি আসতো অর্থাৎ আমাদের জেলার আমাদের জেলের মেয়াদ সরকার থেকে বাড়িয়ে দিত ১০ দিন ১৫ দিন। আমরা আতঙ্কে থাকতাম যে আবার হঠাৎ করে কতদিন না বাড়াই দেয়। আমাদের পরিবার-পরিজন যখন দেখা করতে আসত তখন আসলে ওরা অনেক কান্নাকাটি করত। এরকম একটা পরিবেশে থেকে দেখে আমরা অভ্যস্তহয়ে গেছিলাম যে কান্না পেলেও কান্না করা যাবে না।

কারাবন্দীর অভিজ্ঞতা- ১৭

রাজনৈতিক কারাবন্দী আহাদ (ছদ্মনাম) বলেন, সময়টা ১৯৯১ পরবর্তী। রাজনৈতিক কোন্দলকে কেন্দ্র করে আমাদের প্রায় ১০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। জেলখানায় অন্য কেউ পরিচিত নাই। রাত তিনটার দিকে আমাদেরকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হলো এবং আমরা খুব ভয় এবং আতঙ্কে ছিলাম। এরপর ১০ জনকে যখন ডান্ডাবেড়ি পরানো হলো, পাঁচজন পাঁচজন করে দুইটা গাড়িতে আমাদেরকে তুলল। আমরা কিন্তু তখনো একসঙ্গে আছি...আল্লাহ করতেছি, যাচ্ছি আর ভাবছি আমাদেরকে আসলে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। পরবর্তীতে জানলাম যখন আমাদেরকে নীলফামারী থেকে রংপুর জেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এরপর আমাদেরকে একটা রুমের মধ্যে রাখল এবং আমাদেরকে নিয়ে গিয়ে বললো যে তোমরা কোথা থেকে আসছ কি করছো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা জানি অতএব এখানে কিন্তু ভালোভাবে থাকবে। আমরাও তখন বললাম, আমরা ভালোভাবেই থাকবো। এরপরে

আমরা আমাদেরকে একটা কম্বল দিল এবং আমরা একটা কম্বল নিয়ে ১০ জন একই কম্বলের নিচে ছিলাম। কেউ কেউ আরেকজনের পেটের উপরে মাথা এভাবে আমরা আসলে এমন একটা পরিস্থিতিতে ছিলাম যে কি আর বলব; শীতের রাতে একটা মাত্র কম্বলের নীচে দশজন। এক কম্বলের নিচে কিভাবে এতজন থাকা সম্ভব? এরপর সময় গড়াতে থাকে থাকে। আমাদের চুলন্যাড়া করার মতো করে চুলকেটে দিলো। একজন আরেকজনকে চেনা যায়না, মাঝে মাঝে অনেক রাগ হতো নিজের উপর। যে খাবার ওই সময় ছিল ওই খাবার দিয়ে আসলে আমাদের পেট ভরেনা অর্থাৎ আমরা যখন রংপুরে আসি তখন আমাদেরকে একটা মাত্র রুটি আর গুড় দিত। জেলখানার খাবার খেয়ে যাঁদের পোষাতো না তারা জেলের ভেতরের দোকান থেকে খাবার কিনে খেত। একটা পর্যায়ে গিয়ে আমার বাবা এবং আমাদের আরও যে দশজন ছিল সবার বাবা একত্রিত হয়ে আমি শুনলাম যে তারা কিছু কিছু করে অর্থ উপার্জন করে, কেউ হয়তোবা জমি বন্ধক রেখে সবাই মিলে হাইকোর্টে মামলা পরিচালনার জন্য উকিল ধরেছিল। ৯ মাস কেটে যায়। এদিকে আমার বাবা ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। একে একে নয় জন জামিন পেয়ে যায় কিন্তু আমি পাই না। এরমধ্যে আমি আমার বাবাকে হারাই চিরদিনের জন্য। এই সময়টা আমার জন্য যে কি রকমের ছিল তা বলে বুঝাতে পারবো না। শেষ পর্যন্ত কোনো নেতা কর্মীর সাহায্য পাই নাই। তবে জেলখানার মধ্যে যে জেলকোডের আইন সেটা কিন্তু একটা এখনো আছে এবং এটা কিন্তু ব্রিটিশদের তৈরি করা। আইন যদিও কিছু কিছু জায়গায় হয়তো বা সংস্কার করা হয়েছে কিন্তু এই আইনটা অনেক কঠোরভাবে মানাহয়। এ খনকার জেলখানা কিন্তু অনেক আধুনিক এবং অনেক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত। আগে যেমন থাকার জায়গা ছিল কিন্তু এখনতো বিশাল জায়গা এবং অনেক সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে কিনা আমি জানিনা, তবে দিতে পারে। তোমার জেলখানায় ক্যান্টিন আছে যেখানে আপনি টাকা দিলে আপনার ইচ্ছামত আপনি খাবার কিনে খেতে পারবেন আগে কিন্তু এই সুযোগটা ছিলনা। পাশাপাশি দেখা গেল যে দাম কমবেশি।

টাকা নেই তার অবস্থা যে খুব খারাপ তা না। যার টাকা নেই সে সরকারি বরাদ্দ অনুযায়ী যতটুকু পাওয়ার ততটুকু পাইছে, ততটুকু নিয়েই বেঁচে থাকতে হত। আর যদি ভালো না লাগে সে নিজের টাকা দিয়ে অন্যকিছু কিনে খাবে। যার টাকা আছে তার অনেক কিছুর সুযোগ-সুবিধা আছে।

কারাবন্দীর অভিজ্ঞতা- ১৮

কারাবন্দী শাহাদত (ছদ্মনাম) বলেন, বিশেষ ক্ষমতা আইনে যাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয় তাদের মধ্যে আমি একজন ছিলাম এবং আমার সঙ্গে আরও কয়েকজন ছিল। আমাদেরকে বাইরের কারও সঙ্গে দেখা করতে দিতনা, পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে তেমন দেখা করতে দিতনা। আমাদেরকে আসলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতিক্রমে ১৫ দিন, একমাস বা দুইমাস পরপর আমাদের পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে দেখা করতে দিত এবং সর্বোচ্চ আধাঘণ্টা একঘন্টা সময় দিত। তবে এখন মনে হয় বিশেষ ক্ষমতা আইনে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয় না। এটা সম্ভবত উঠে গেছে বা হতে পারে ঠিক আমি জানিনা। তবে আমাদেরকে ওইরকমই একটা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে জেলের মধ্যে থাকতে হয়েছে। জেলখানার ভিতরে গান-বাজনা করতাম এবং অনেকেই আমাদের মধ্যে রসিক ছিল। কিন্তু এটা সবার জন্য উন্মুক্ত ছিলনা। সাধারণ যারা কয়েদি দিয়ে ছিল তারা দূর থেকে এগুলো দেখতো, তারা আমাদের এ ধারে কাছে আসলে আমাদেরকে তেমন কিছু বলতো না। যেহেতু আমরা স্থানীয় ছেলে এবং আমরা প্রকৃতপক্ষে ওরকম কোন অপরাধ করে যায়নি যে আমাদের জন্য আইন-শৃংখলার কোন সমস্যা হবে। যেহেতু আমরা রাজনৈতিক মামলায় গিয়েছিলাম তাই তারা জানে- যুবক ছেলেপেলে একটু গান-বাজনা করবে। তেমনভাবে আমাদেরকে কোন বাধা দিতনা। তবে এটা কিন্তু সবার জন্য উন্মুক্ত ছিলনা। যারা বড় ধরনের আসামি ছিল তাদের আসলে এ ধরনের সুযোগ নাই, কারণ ওদেরকে যদি এধরনের সুযোগ দেওয়া যায় তাহলে তারা আসলে জেলখানার শাস্তি এই জিনিসটা তারা ফিল করবেনা এবং তারা মনে

করবেনা। এটা কোন ব্যাপারনা এবং তারা আরও অপরাধে যাবে আর পাশাপাশি যারা বড় ধরনের অপরাধ করে তাদেরকে যদি এধরনের সুযোগ হয় তাহলে পেলেই ওরা পালিয়ে যাবে। ওদের পালিয়ে যাওয়া মানে চরম বিপদ। আমরা যারা আছি তারা পারব না কারণ আমাদের ওরকম কোন অপরাধ নাই, আমাদের জামিন হয়ে যাবে এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া মানে একটা বড় অপরাধ নিজেদেরকে জড়ানো।

১.৩ কেন্দ্রীয় ও জেলা কারাগারের সাবেক কারাভোগীদের অংশগ্রহণে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন- ১

বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগারের বন্দী ছিলেন এমন ১০ জন কারাবন্দীর কারাজীবনের অভিজ্ঞতা জানার জন্য একটি ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন আয়োজন করা হয় বরিশাল শহরে পূর্ব বগুড়া রোডের একটি বাসায়। ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে ভিন্ন ভিন্ন পেশাজীবী ও বয়সের ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এতে বর্তমান গবেষণার গবেষক সূত্রধর হিসেবে যুক্ত ছিলেন। ডিসকাশনটিতে সাংবাদিক, ঠিকাদার, ক্যাবল অপারেটর ব্যবসায়ী (ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট যোগানদাতা), ছাত্র, রাজনীতিবীদ বিভিন্ন পেশার ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে সংঘটিত অপরাধে, কিংবা মিথ্যা মামলার জেরে সাজাপ্রাপ্ত হয়ে হাজত ও কারাবাস করেছেন এমন বন্দীরা উপস্থিত হয়েছিলেন।

তাদের আলোচনায় যেসকল বিষয় উঠে এসেছিলো তার মধ্যে অন্যতম একটি হলো, কারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ‘ভারবালি এবিউজ’ হওয়ার ঘটনা। ৫৬ বছর বয়সী মো: আহাদুল (ছদ্মনাম) জানান যে, পেশায় তিনি বরিশাল বেতারে একজন উপস্থাপক। উপস্থাপনার পাশাপাশি স্থানীয় স্বনামধন্য একটি নাট্যদলের নিয়মিত মঞ্চ অভিনেতা। বরিশাল বেতারের একটি দামি মেশিন সংরক্ষণের দায়িত্বে তিনি ছিলেন, ভবন সংস্কার কাজ চলাকালীন মেশিনটি চুরি গেলে বেতারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা চোর সাব্যস্ত করে তাকে পুলিশ সোপর্দ করে। তিনি বন্দী অবস্থায় তার সাথে ভালো আচরণ করেনি অনেক কারারক্ষী। তিনি বলেন, “কারারক্ষীরা খুব খারাপ ব্যবহার

করে। তুই তুকারি করে, এটা আমি নিতে পারতাম না"। এই বক্তব্য থেকে 'ভারবালি এবিউজে'র সমর্থনে প্রমাণ পাওয়া যায়।

কারারক্ষীদের অসহিষ্ণু ও অবন্ধু সুলভ আচরণের পাওয়া যায় মো: হামীম মিয়ার (ছদ্মনাম) কথাতেও। হামীম (৩৩) জানান, তিনি একজন সাংবাদিক। জাতীয় একটি দৈনিক পত্রিকায় কাজ করেন এবং সেই পত্রিকার বার্তা সম্পাদক হিসেবে কর্মরত। বঙ্গবন্ধুর নামে ম্যুরাল তৈরির নামে প্রায় ২২ লক্ষ টাকা সরকারী অনুদানের অর্থ আত্মসাৎ -এর বিষয়ে সংবাদ করলে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের আওতায় একটি মামলায় জেলে কাটাতে হয় তাকে। তিনি বলেন, "সাধারণ কারারক্ষীরা খুব খারাপ ছিল। কারণে অকারণে শাস্তি দিত"।

ঠিকাদারী পেশায় নিয়োজিত এবং একই সাথে স্থানীয় ইউপি সদস্য হরিচাঁদ কীর্তনীয়া (ছন্মনাম)। হরিচাদ (৫৭) কারাগারে খাবার নিয়ে আক্ষেপের সুরে বলেন "অভিজ্ঞতা বলতে গেলে এখানের খাবারের মান খুবই খারাপ ছিল। আমি তো অল্প কিছুদিন খেয়েছি, যারা বছরের পর বছর খাচ্ছে তারা কিভাবে বেচে আছে এটাই ভাবছি"। এই কথার রেশ ধরে পাশ থেকে একজন বলেন, "খারাপ অভিজ্ঞতার শেষ নাই খাবারের সমস্যা, গোসলের সমস্যা, ঘুমানো সমস্যা"। কথাগুলো বলছিলেন মাদক মামলায় ফেসে যাওয়া ২৫ বছর বয়সী তরুণ গালিব ইসলাম (ছদ্মনাম)। তার ভাষ্যমতে তিনি কারা অভ্যন্তরে কোন মনঃচিকিৎসকের দেখা পাননি। তবে ভেতরে যে হাসপাতালে ডাইরিয়ায় অসুস্থ হয়ে ভর্তি ছিলেন সেটার কথা উল্লেখ করেন। বলেন, তার অবস্থা সংকটাপন্ন হলে কারা অভ্যন্তরের একটি হাসপাতালে চারদিন ভর্তি রেখে চিকিৎসা প্রদান করা হয়। বন্দীদের সাংস্কৃতিক চর্চার অভিজ্ঞতা নিয়ে গালিব বলেন, কারাবন্দীরা মাঝে মধ্যে বিনোদনের জন্য হারমোনিয়াম নিয়ে গানের আসর বসালে তিনি গিয়ে অংশগ্রহণ করতেন। কারাবাসীদের বন্দী দশায় বহুমাত্রিক মিশ্র অভিজ্ঞতার

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে প্রতিনিয়ত, যেগুলোর অধিকাংশই ছিল নেতিবাচক এবং একই সাথে তাদের সার্বিক আত্মোন্নতির পক্ষে তথা সংশোধনের বিপরীতমুখী। অহিতকর।

কারাবন্দীদের বক্তব্যের পরিপেক্ষিতে এটাই বোঝা যায় যে, তারা কারাগারের মধ্যে একটি সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চা কেন্দ্র পেতে চায়। কিন্তু কারা কর্তৃপক্ষ সেই ব্যাপারে ততটা উদ্যোগ গ্রহণ করেন না। কারাগারের অভ্যন্তরে কারা কর্তৃপক্ষ এবং কারাবন্দীদের মধ্যে কথোপকথন হয়েছে তার অনেকটা অমিল খুঁজে পাওয়া যায়। কারা কর্তৃপক্ষ বলছে এখানে সংস্কৃতি চর্চার সকল ব্যবস্থা এবং মাধ্যম অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু কারাবন্দীরা বলছেন অন্য কথা তারা তাদের প্রয়োজনমতো কোন কিছুই এখানে পাচ্ছেন না। তারা খেলাধুলা করার জন্য উপকরণ সামগ্রী পাচ্ছেন না তারা অবসর সময় কাটানোর মত সেই ব্যবস্থাও তেমন পাচ্ছেন না। পয়ঃনিষ্কাশনের তো খুবই বাজে অবস্থা প্রায় ৫০ জন থেকে ৬০ জন কারাবন্দী একটি বাথরুম ব্যবহার করেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে কিছুদিন পরপর তারা বিভিন্ন ধরনের রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। এখানে খাবার ব্যবস্থাপনা নিয়ে সবারই আপত্তি রয়েছে খুবই নিম্নমানের খাবার সরবরাহ করা হয়। কারা কর্তৃপক্ষ এবং কারাবন্দীদের কথার পরিপ্রেক্ষিতে এটাই বোঝা যায় যে এখানে তদারকি করার মত তেমন কেউ নেই। তাই কারাগারের অভ্যন্তরে সরকারিভাবে একজন নিয়োগ দেওয়া উচিত চিনি সকল সুবিধা ও অসুবিধা পর্যালোচনা করবেন এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন- ২

পটুয়াখালী কারাগারের কয়েদবাস জীবনের বিবিধ অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অবগত করছিলেন মো: এনামত আলী (ছদ্মনাম)। ৬৫ বছর বয়সী এনামত ভাগ্যান্বেষনে পাড়ি দিয়েছিলেন বিদেশ বিভূঁই। কর্মসংস্থান জন্য জীবনের প্রায় পঁচিশটি বছর কাটিয়েছেন বিদেশের মাটিতে প্রবাসী হয়ে। একমাত্র ছেলে এনাম, পুত্রবধূ ও দুইজন নাতিকে নিয়ে বসবাস করছিলেন। কিন্তু একটি ধর্ষণ মামলায় আসামী হয়ে তাকে কারাবরণ করতে হয়। তিনি বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

“...সে অনেক কথা। একটি মিথ্যা ধর্ষণ মামলায় আমাকে ফাঁসানো হয়েছে। আমার জীবন থেকে ওরা অনেকগুলো সময় নষ্ট করে দিয়েছে”। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত এনামত আলী আরো জানান, বিদেশে গিয়ে বেশ কিছু অর্থ সঞ্চয় করেন যা দিয়েই মূলত পরিবার চলত কিন্তু মামলার ব্যয়ভার বহন করতে গিয়ে প্রায় ১০ লক্ষাধিক টাকা খরচ হয়ে গেছে। ধর্ষণ মামলায় ৫ বছর কারভোগ করতে হয়, তিনি কয়েদি থাকাকালীন কারা অভ্যন্তরীণ পরিচালিত বিভিন্ন স্বেচ্ছাশ্রমে অংশগ্রহণ করতে। ঠিক কী ধরনের কাজ করতেন জানতে চাইলে বলেন, “আমি অনেক কাজ করেছি পরিস্কার পরিচ্ছন্নতায় যুক্ত ছিলাম”। কারাগারে স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে বলেন, কারাগার একেকটা দিন একেকেটা বছর মনে হয়েছে তার কাছে। "জেলে এসে এমন কোন রোগ নাই যেটা আমার হয়নি"। তার ভাষ্য মতে, পটুয়াখালী কারাগারে স্বাস্থ্য সেবা তথা আবাসিক সুবিধা সমূহ বয়োঃপ্রাপ্ত কয়েদিদের বিশেষত এনামত আলীর মত কয়েদিদের জন্য যথেষ্ট না। সেখানকার কারাবন্দীদের নিয়ে কী ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় সেটার বর্ণনায় তিনি বলেন, "আমি প্রথমে পটুয়াখালী জেলে ছিলাম অল্প কিছু দিন তখন কিছু দেখিনি। তারপর বরিশাল কেন্দ্রীয় জেলে যখন আমাকে নেওয়া হয় তখন অনেক অনুষ্ঠান দেখেছি, যেমন গানের অনুষ্ঠান, নাচের অনুষ্ঠান, বাউল গানের অনুষ্ঠান, বিভিন্ন খেলাধুলা হতো। এখানে অনান্য কয়েদিরা গান বাজানা করতো। প্রথম দিকে আমি দেখতাম। পরে আমিও ওদের সাথে গান বাজনা করতাম। আমার জেলে অবসর সময় ঘুমিয়ে কাটত, মাঝে মধ্যে ক্যারাম লুডু খেলতাম। তবে আমার ভালো ব্যবহারের জন্য সব কর্মকর্তারা আমাকে অনেক পছন্দ করতো। আমি সাড়ে পাঁচ বছর যখন বের হয়ে যাই তখন সবার চোখে পানি চলে আসে”।

উক্ত ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে উপস্থিত ছিলেন ঊনচল্লিশ (৩৯) বছর বয়সী অংশুল দেবনাথ (ছদ্মনাম)। কারাভোগের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি জানান, “পানের ব্যবসায়ী নিয়োজিত ছিলাম চুরির মামলায় জেলে যেতে হয়। জেলের জীবন অন্য রকম জীবন। কারারক্ষীরা আমাদের সাথে খুব খারাপ আচরণ করতো।

Dhaka University Institutional Repository

আমার সময় কাটতো না। অবসর সময় ওয়ার্ডের কয়েদিদের সাথে বসে বসে লুডু খেলে সময় পার করতাম। মাঝে মধ্যে গান বাজনা হতো। আমিও তিন চার দিন ওদের সাথে গান বাজনায় যুক্ত ছিলাম"।

স্বর্ণ ব্যবসায়ী মধুকর (ছদ্মনাম, বয়স-৫২) তিনি ইউপি সদস্য থাকাকালীন সময়ে একটি মামলায় বেশকিছু দিন কারাগারে ছিলেন। তিনিও উপস্থিত ছিলেন এই ডিসকাশনে। অংশুল দেবনাথের কথার রেশ টেনে তিনি বলেন, "আমি যখন ছিলাম তখন একবার কারা দিবস পালন করতে দেখেছি। সেই অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক মহোদয় এসেছিলেন"। মধুকর তার অবসর সময় খবরের কাগজ পড়ে পার করতেন। তিক্ততার সাথে নিজের আবেগ প্রকাশ করে বলেন, "গার্ডরা অমানবিক আচরণ করতো। কারাগারে কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না"।

ডিসকাশনে মহিদুল মৃধা (ছদ্মনাম) নামের একজন সাবেক কয়েদির বক্তব্যে বলেন যে, তিনি দীর্ঘ ছয় মাস কারাভোগ করেছেন। নিজের ছেলের বউ নারী নির্যাতনের মামলা করেন। সেই মামলায় আসামী হতে হয় মৃধাকে। কারাগারে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বিশেষত কারাগারের বাগান দেখভালের কাজ করত, বাগানের আগাছা পরিস্কার করতো। অর্থাৎ তিনি সশ্রম কারাদণ্ড ভোগী ছিলেন। তিনি অধিকাংশ দিন বিকেলে অনান্য কয়েদিদের সাথে বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডে যেমন- গানের আসরে যুক্ত হতেন। কারা অন্তরীণ সময় বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় ভোগেন, বর্তমানে দীর্ঘ মেয়াদি শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন তিনি। মৃধা বলেন, "খাবার দাবারে খুব সমস্যা। আমার তো পেটে সমস্যা হয়ে গিয়েছিল ছিল। জেল থেকে বের হয়েছি এক বছর কিন্তু পেটের সমস্যা এখনো ঠিক হয় নাই"।

উক্ত ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে সূত্রধর হিসেবে সংযুক্ত থাকা এবং পটুয়াখালী জেলা কারাগারের ডেপুটি জেলার মোহাম্মদ ইব্রাহিমের সাথে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে আমার এটাই উপলব্ধি হয় যে, তারা মুখেই শুধু

Dhaka University Institutional Repository

বলে যে এটা কারাগার নয় এটা একটি সংশোধনাগার। কিন্তু কারাগারে তাদের কার্যক্রম দেখে বা তার সাথে কথা বলে কোনও সামঞ্জস্যতা পাওয়া যায় না। জনাব মোঃ ইব্রাহিম বলেন এখানে কারাবন্দীদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য আমরা অনেক ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। কারাবন্দীরা শারীরিকভাবে যেন সুস্থ থাকে এজন্য আমরা তাদের জন্য সবসময় সুষম খাবারের ব্যবস্থা করি। মানসিকভাবে যেন তারা ভালো থাকে এজন্য আমরা তাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার সামগ্রী সরবরাহ করে থাকে এবং বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম করে থাকি। অথচ যখন একজন কারাবন্দীর সাথে আমি কথা বলতে যাই তখনই আসল ঘটনা বেরিয়ে আসে। কারাবন্দীদের সাথে তারা যাচ্ছেতাই ব্যবহার করত, কারণে অকারণে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করে থাকে। কারাবন্দীদের বিনোদনের কোন মাধ্যম এখানে নেই। অবসর সময় কাটানোর জন্য কোন খেলাধুলার ইন্সট্রুমেন্ট এখানে নেই। চারিদিকে শুধু নেই আর নেই। কিন্তু যখন একজন সজন কারা কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলতে যায় তখন তিনি বলেন এখানে কারাবন্দীদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য চমৎকার ব্যবস্থা আছে তারা এখানে বেশ ভালোভাবেই জীবনযাপন করছে।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন- ৩

বরগুনা জেলা কারাগারে বন্দী ছিলেন এমন পাঁচজন পুরুষ বন্দীকে একটি ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে যুক্ত করা হয়। অংশগ্রহণকারীদের অনুরোধে তাদের প্রকৃত নাম ব্যবহারের পরিবর্তে ছদ্মনাম ব্যবহার করা হলো। এরা হলেন মোকাম হলাদার (৪৫), মো: খলিশা (৫০), মো: মিনহাজ (৩২), মো: সরফরাজ ও মো: কমল (৩৯)।

মোকাম ও খলিশা তারা সম্পর্কে সহোদর, পেশায় দিন মজুর। ভূমি দখলের মামলায় জেলে যেতে হয় হয় দুই ভাইকে, তবে তারা কয়েদি নন, হাজতি। অন্যদিকে একমাত্র মিনহাজ ব্যতীত বাকিরা সবাই ছিলেন হাজতি। মিনহাজের সাথে তার স্ত্রীর দীর্ঘদিন পারিবারিক কলহ ছিল। তার স্ত্রী তার বিরুদ্ধে শারীরিক ও মানসিক

Dhaka University Institutional Repository

নির্যাতন অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করেন। নারী নির্যাতনের মামলায় তাকে জেলে যেতে হয়। মিনহাজ দেড় বছর কারাবন্দী ছিলেন। সরফরাজ একজন ছাত্র, তিনি বন্ধুদের সাথে মাদক মামলায় জেলে যান। মো: কমল তিনি রড-বালু-সিমেন্টের ব্যবসা করেন। তার ভাষ্যমতে, বিরোধী দলীয় রাজনীতি করার দরুণ প্রতিপক্ষ তাকে অন্যায় ভাবে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়েছে।

মোকাম জানান, তিনি তার ভাই খলিশা বেশ কয়েক মাস জেলে ছিলেন। কিন্তু কারাগারে থাকাকালীন তাদের কোনো কাজ করতে হয়নি। তবে মিনহাজ বলেন, যেহেতু তিনি দীর্ঘ সময় কারাগারে ছিলেন তাই তাকে বিভিন্ন কাজ করতে দেওয়া হতো। তিনি মালি ও বাবুর্চির কাজ করতে বলে জানা যায়। বাকিদের কোনও কাজ করতে হয়নি এমনটা বলেন তারা।

মিনহাজ বলেন, "আমি যতদিন জেলে ছিলাম অনেক ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতে দেখেছি। বিভিন্ন ধরনের জাতীয় প্রোগ্রামগুলোতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। যেমন কারা দিবসে জেলা প্রশাসক মহোদয় আসেন এবং ওই দিন বিনামূল্যে ভালো খাবার বিতরণ করেন। পহেলা বৈশাখে সমাজসেবার অফিসার আমাদের জন্য ভালো খাবারের ব্যবস্থা করছিলেন। এছাড়া ওইদিন নানা ধরনের গান, নাচ অভিনয় অনেক কিছু দেখা যায় জেলের মধ্যে। কয়েদিদের মধ্যে যারা ভালো গান করেন তারা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। একদম মুক্ত অনুষ্ঠান বলা চলে; যে কেউ চাইলে গাইতে পারে"। মিনহাজের বক্তব্য অনুসারে ঠিক কী ধরনের খাবার সরবরাহ করা হয় বা খাবারের তালিকা, মান, উপাদান ও গুনাগুণ ইত্যাদি বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায় না। সেইসাথে সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় পরিচালিত অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু ও চিন্তা সম্পর্কে খুব একটা ধারণা পাওয়া যায় না।

বরগুনা কারাগারেও পূর্বে উল্লেখিত কারাগারের মতই কয়েদিদের সময় কাটতো টুকটাক ইনডোর গেমস ও বিভিন্ন খেলাধুলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে। তারা বেশিরভাগ লুডু অথবা ক্যারাম খেলে সময় পার করতেন। কেউ

Dhaka University Institutional Repository

কেউ আবার দৈনিক জাতীয় পত্রিকা পড়তেন। কেউ আবার দাবার খেলার সঙ্গী খুঁজে নিতেন। তবে সবার মধ্যে সাধারণ যে বিষয়টি প্রগাঢ়ভাবে লক্ষ্যণীয় সেটা হলো মানসিক উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও তীব্র হতাশা। অনেকেই নিজেদের পেশা, আয়, ব্যবসা ইত্যাদি নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। যেমনটা বলছিলেন কমল, "আমি আমার ব্যবসা নিয়ে খুব চিন্তিত ছিলাম, কারণ যতদিন জেলে ছিলাম আমার ব্যবসাপাতিও সব একেবারে বন্ধ ছিল"। বন্দীদের জেলে থাকার কারণে পারিবারিক নানা বিপর্যয় দেখা দেয়। পাওনাদার ও বিভিন্ন পক্ষের সামাজিক চাপ সহ্য করতে হয়েছিল তাদের পরিবারগুলোকে। কয়েদিদের মানসিক স্বাস্থ্য সেবায় কোনও ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল কিনা জানতে চাইলে নিরুত্তর থাকেন সকলেই।

কারাগারে অনান্য অভিজ্ঞতা কথা বলতে গিয়ে এদের একজন অসন্তোষের সহিত জানান, "জেলের বাথরুমে অবস্থা খুব খারাপ ছিল- বলার মত না একেবারে। একটা মাত্র পায়খানায় এতো মানুষ যায় যে কি বলবো! প্রতিদিন প্রায় ত্রিশজনের মত কয়েদি একটা মাত্র বাথরুম ব্যবহার করে। বাথরুম ব্যবহার করতে করতে ময়লার প্রলেপ পড়ে গেলেও কেউই পরিস্কার করতে আসতো না। এখানে বরগুনা জেলখানায় একটি অভিযোগ বক্স আছে, সেখানে চার-পাঁচবার অভিযোগ করার পরে তারপরে লোক আসেন বাথরুম পরিস্কার করতে"। আরেকজন জানান, "এখানে আরেকটা বিশাল সমস্যা আছে সেটা হইল মশার জ্বালা। জেলের ভেতর এত মশা কেন? কেন তারা কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে না? জেলে মশার কামড় খেয়ে অনেকে হাসপাতালে পর্যন্ত ভর্তি হয়। ডেঙ্গু পর্যন্ত হয়ে যায় অনেকের কিন্তু কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে না"।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন আয়োজন ছাড়াও বর্তমান গবেষণার গবেষক বরগুনা জেলা কারাগারে সরেজমিনে পরিদর্শন ও জেল সুপার আমজাদ হোসেনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। উপরোক্ত সূত্রমতে প্রাপ্ত প্রাথমিক উপাত্ত এবং জেল সুপার মহোদয়ের কথার সাথে তার অনেক অমিল খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

“এখানে কারাবন্দীদের সব রকম সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়”। কিন্তু কারাবন্দীদের সাথে কথা বলার পর তার কথার সাথে কাজের কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। বরগুনা জেলা কারাগারে সর্বমোট কারাবন্দী আছে ৪০৮ জন। এতজন কারাবন্দীর জন্য মাত্র একজন সহকারী সার্জন অর্থাৎ এমবিবিএস ডাক্তার নিযুক্ত রয়েছে। আর দুইজন জুনিয়র নার্স নিযুক্ত রয়েছেন। চারশোর অধিক কারাবন্দীদের কিভাবে একজন এমবিবিএস ডাক্তার দ্বারা পরিচালনা করা হয়। এইজন্য কারাবন্দীদের মুখে প্রায়ই শোনা যায় অসুখ বা কোন রোগ হলে তাদেরকে বরগুনা জেলার সদর হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয় উন্নত চিকিৎসার জন্য। এখানে কারাবন্দীদের এক একজনের জন্য গোসল করার জন্য দুই থেকে আড়াই লিটার পানি বরাদ্দ থাকে। দুই থেকে আড়াই লিটার পানি দিয়ে একজন মানুষ কিভাবে গোসল করে বোঝা মুশকিল। অবসর সময় কাটানোর জন্য এখানে কোন ধরনের মাধ্যম নেই। এখানে কোন ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা নেই। কর্মকর্তাদের সাথে কথা বললে তারা বলে এখানে সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধা আছে কিন্তু গান-বাজনা জন্য কোন হারমোনিয়াম, ফুল বাসি বা কোন বাদ্যযন্ত্র এখানে নেই। খেলাধুলা করার জন্য এখানে কোন ধরনের খেলাধুলার সামগ্রী নেই। কাগজে-কলমে বরগুনা জেলা কারাগারের সব কিছুই আছে কিন্তু বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাদের কাগজে-কলমে তথ্যের সাথে বাস্তবচিত্রের অনেক অমিল খুঁজে পাওয়া গেছে।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন- ৪

ভোলা জেলা কারাগারের কয়েকজন সাবেক বন্দীর ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে ফুটে ওঠে তাদের কারা অন্তরীণ জীবনের চিত্র। এতে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিরা (ছদ্মনাম) হলেন, সাধু মাঝি, রূপচান মাঝি, রবি মাঝি, কাশেম মাঝি ও ভাসান মাঝি। এদের প্রত্যেকের বয়স ৩৫ থেকে ৪৫ এর মধ্যে। শুধুমাত্র ভাসানের (রূপচানের ছেলের) বয়স ১৮ বছর। মাছ ধরাই পেশা সকলের। তাদের পূর্ব পুরুষ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে

Dhaka University Institutional Repository

মাছ ধরার পেশায় যুক্ত। সে অনুযায়ী তারাও এই পেশাতেই যুক্ত আছেন। তাদের মধ্য থেকে কাশেম জানান, তারা নদীর পাড়ে বসবাস করে। তারা কেউই স্থানীয় নন, সকলেই এসেছে চরফ্যাশন থেকে। তাদের সন্তান ও পরিবার নিজেদের সাথেই থাকে। এই জেলে সম্প্রদায় চায় তাদের সন্তানেরা লেখা পড়া করুক, এই পেশায় যুক্ত না হোক। সমুদ্রে মাছ শিকারে আছে প্রতিকূল পরিবেশ আর হাজারো বিধিনিষেধ। করোনাকালীন সময়ে মাছ শিকারে গিয়ে নৌ পুলিশের হাতে ধরা পরেন এই মানুষজন। এই প্রসঙ্গে রূপচান বলেন, "করোকালীন সময়ে আমরা সবাই জেলে আসছি। মা ইলিশ ধরা নিষিদ্ধ ছিল, সেই আদেশ অমান্য করে আমরা নদীতে পাঁচটা নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে গিয়েছিলাম। ঘন্টা খানেক মাছ ধরার পর হটাৎ দেখি তিনটা স্পিডবোট তিন দিক থেকে এসে ঘেরাও করে ফেলে আমাদের। তিনটা স্পিডবোটে ১০ জন পুলিশ আর ইউএনও স্যার ছিলেন। আমাদের ১২ জনকে ৬ মাসের কারাদণ্ড দেয় সাথে ১০ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড"।

কবিরের ভাষ্য হলো, "জেলে আমাদের একেকজনের একেক ধরনের কাজ ছিল। সাধু, রূপচান আর আমি মালির কাজ করতাম, মানে ঘাস পরিস্কার করতাম, ঝাড়ু দিতাম। কাশেম ভালো রান্না করতে পারতো তাই এই জন্য কাশেমের দায়িত্ব ছিল বাবুর্চি হিসেবে রান্না করা। ভাসান সবার চেয়ে কম বয়সী ছিল তাই ওর তেমন কোন কাজ ছিল না"।

তাদের আলোচনা থেকে জানা যায়, বিভিন্ন ধরনের জাতীয় দিবস যেমন পহেলা বৈশাখ, ২৬ শে মার্চ, ২১ ফেব্রুয়ারি এই সব জাতীয় দিবসে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত। ১৬ ডিসেম্বর জাতীয় অনুষ্ঠানে তারা সকলেই কারাগারে ছিলেন। জেলা প্রশাসক এসেছিলেন, তিনি কয়েদি জন্য দুপুরে খাবারের সুব্যবস্থা করেন। কারা দিবসে কয়েদিরা গান, কৌতুক অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছেন। পহেলা বৈশাখে পান্তা ইলিশ খাওয়ানোর ব্যবস্থা, এবং অনেকেই হাডুডু খেলায় অংশগ্রহণ করেন বলে অভিমত প্রকাশ করেন। কয়েদিদের জন্য প্রতিদিন বিকেলে

Dhaka University Institutional Repository

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। তাদের অনেকেই গান বাজনায় অংশগ্রহণের কথা জানান। প্রতিদিনের গান বাজনার আসর ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকতো। ভাসান বলেন, "আমরা প্রায়ই কেরাম খেলতাম এবং রাতের বেলা যে যার ওয়ার্ডে বসে লুডু খেলতাম। এভাবেই আমাদের অবসর সময় কেটে যেত"। কবির বলেন, "কারাগারে ভালো অভিজ্ঞতা বলতে আমরা সবাই একসাথে ছিলাম। একদিন শাহজাহান ভাই খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার পেটে মারাত্মক সমস্যা দেখা দেয়। তার এই অবস্থা দেখে অনান্য কয়েদিদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল কিভাবে তাকে হাসপাতালে নেওয়া যায়"। তিনি কারারক্ষীদের এমন বন্ধুসুলভ আচরণের প্রশংসা করেন। তবে কারারক্ষীদের সবাই একরকম ছিল না বলে জানা যায়। কেউ কেউ বন্দীদের সাথে খারাপ আচরণ করতো। কারণে অকারণে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি দিতো।

খাবার মান নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন প্রত্যেকেই। এদের মধ্যে একজন বলেন, "গোসল করার মত পানি থাকতো না, বাথরুমে অবস্থা খুব খারাপ ছিল। বিশ থেকে পঁচিশ জন মিলে আমরা একটা বাথরুম ব্যবহার করতাম। জেলখানার ভিতর অনেক মশা ছিল। মশার কামড়ে অনেকের নানা অসুখ-বিসুখ হয়ে যেত"।

কয়েদির অধিকাংশ বন্দী অবস্থায় স্বজন নিয়ে মানসিকভাবে দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের মধ্যে থাকতো। এদের একজন বলেন- 'আমরা জেলে থাকাকালীন আমাদের পরিবারের অবস্থা খুব শোচনীয় ছিল। ঘরে, চাল, ডাল, নুন কিছুই থাকতো না। বলতে গেলে আমাদের পরিবারের মানুষজন এক রকমের না খেয়েই দিন পার করতো'। যেহেতু তাদের হাতে নগদ কোন টাকা পয়সা সঞ্চিত থাকতো না, যার ফলে বন্দী অবস্থায় পরিবারের ভরণপোষণের চিন্তায় অনেকেই মুষড়ে পড়তেন। ফলে তাদের পরিবারের সদস্যদের অনেক কষ্টে জীবন যাপন করতে হয়েছে। কিন্তু তাদের এই ধরনের মুহূর্তে কোন মনঃচিকিৎসার কথা উল্লেখ পাওয়া যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

জেলার মহোদয়ের ভাষ্যমতে, কারাগারের অভ্যন্তরে কারাবন্দীরা বেশ ভালো আরাম-আয়েশে জীবন-যাপন করছেন। কিন্তু কারাগারের অভ্যন্তরে যখন কারাবন্দীদের সাথে কথা বলি তখন দেখা যায় চিত্র ভিন্ন। কারাবন্দীরা বলেন তাদেরকে তিন বেলা যে খাবারটি দেয়া হয় এটা কোন সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ মুখে তুলতে পারেনা। মানহীন এবং খুবই বাজে খাবার কারাবন্দীদেরকে সরবরাহ করা হয়। যার ফলে কারাবন্দীরা পেটের বিভিন্ন ধরনের জটিলতায় ভুগে এবং হাসপাতলে ভর্তি হতে হয়। পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার খুবই বাজে অবস্থা। ৪০ থেকে ৫০ জন কারাবন্দী একটি বাথরুম ব্যবহার করে। কারাগারের অভ্যন্তরে রুমগুলো অপরিষ্কার থাকায় এখানে অনেক মশার জন্ম হয় এবং মশার কামড়ে কারাবন্দীদের বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাই লেগেই থাকে। অবসর সময় কাটানোর কোনো ব্যবস্থা নেই। কারনে অকারনে কারাবন্দীদের শারীরিক শাস্তি দেয়া হয়।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন- ৫

রংপুর বিভাগের বিভিন্ন কারাগারে বিভিন্ন সময়ে অন্তরীণ ছিলেন এমন ৬জন ব্যক্তিকে একটি ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে যুক্ত করা হয়। তার মধ্যে একজন ছিলেন, ৬৫ বছর বয়সী জনাব স্বপন (ছদ্মনাম), পেশায় হোমিও চিকিৎসক। ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত কারাগারে ছিলেন। মূলত বাম রাজনীতি করতেন তিনি এবং একটা বাম রাজনৈতিক দলের জেলা সভাপতি ছিলেন। ১৯৭৫ সালে দেশদ্রোহীতার অভিযোগ আটক করা হয় এবং দুই বছর কয়েদবাস করতে হয় তাকে। তিনি বলেন, "তখন দেশের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। প্রথম ১ বছর আমাদের রুম থেকেই বের হতে দেয়নি। ১৯৭৬ এর মাঝামাঝিতে আমরা একটু জেলের মধ্যে হাঁটাচলার সুযোগ পাই। সেই সময়ের পুলিশ কারণ-অকারণে আমাদের মারধর করতো। আমরা খুব ভয়ে থাকতাম"। সেসময়ে সাংস্কৃতিক চর্চা কথা জানতে চাইলে বলেন, "দেশের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। তাই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রশ্নই ওঠে না"।

Dhaka University Institutional Repository

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে উপস্থিত অন্য একজন কয়েদি অভিভূষণ দেবনাথ (ছদ্মনাম, বয়স-৩৫) মাদক মামলায় প্রায় এক বছর কারাবাস করেন। তিনি কারাগারে থাকতে বৈদ্যুতিক মিস্ত্রির কাজ করতেন। অবসর সময় ক্যারাম, লুডু খেলে পার করতেন। তিনি জানান, জাতীয় দিবসে বাহির থেকে শিল্পীরা আসতো। দেশের গান পরিবেশেনা করতেন শিল্পীরা। কোনো কোনো কয়েদিও এই অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করতেন। যাদের অনেকের গানের প্রশংসা করেন তিনি। অভিভূষণ উল্লেখ করেন, জেলে থাকার কয়েক মাস খুবই সংকটের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়ে হয়েছে তাকে। সদ্য বিবাহ করায় পরিবারের খরচ বেড়ে যায়। ধার দেনায় জড়িয়ে যায় সংসার এবং কয়েক লক্ষ টাকার ঋনের বোঝা তার পরিবারের ঘাড়ে এসে পড়ে। যেটা তার এবং তার পরিবার উভয়ের জন্যে উদ্বেগের বিষয় হয়ে ওঠে। কারাগারে কোনো মনঃচিকিৎসার সুযোগ মিলেছে কিনা সে বিষয়ে জানতে চাইলে না বোধক উত্তর প্রদান করেন।

৯০ বছর বয়সী এক প্রবীণ অতুল রায় (ছদ্মনাম)। জীবন সায়াহ্নে এসে কারা জীবনের স্মৃতি-অভিজ্ঞতার কথা বলেন। বিপত্নীক অতুল বর্তমানে ছেলের পরিবারের সাথে থাকেন। দেশদ্রোহীতার অভিযোগে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে ১৯৯০ সালে জেলে যেতে হয় তাকে; কয়েদি হিসেবে ২ বছর কারাভোগ করতে হয়। জেলে একে অন্যের সাথে কথা বলা ও মেলামেশার সুযোগ দেওয়া হতো না। যেহেতু তিনি প্রভাবশালী নেতা ছিলেন তাই তাঁর সাথে আরো কয়েকজন কয়েদিকে আলাদা আলাদা সেলে রাখতো। সব সময় কারাকক্ষ আবদ্ধ করে রাখা হত। কোন ধরনের কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বালাই ছিল না। কেবল ছিল কড়া নজরদারি। নব্বইয়ের দশকে একই অভিযোগে কারাবাস করা ৬৫ বছর বয়সী আরেক কয়েদি প্রাণতোষ দাস (ছদ্মনাম) বলেন, “জেলে একবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রতিবাদী গান পরিবেশেন করি। এরপর থেকে সবাই আমাকে চেনে। তারপর থেকে নিজ উদ্যোগে অনান্য কয়েদিদের নিয়ে হারমোনিয়াম, ঢোল নিয়ে প্রতিবাদী গান গাইতাম। আবার কখনও কৌতুক

Dhaka University Institutional Repository

অভিনয়ও করতাম"। তিনি জানান জেলে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় তরুণ কয়েদিদের শারীরিক শাস্তি দিত। " এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের একটা ছেলেকে ধরে নিয়ে এসেছিল। তাঁর কী অপরাধ ছিল সেটা আমরা জানতে পারিনি এখনো। আমি দেখেছিলাম চার জন পুলিশ ছেলেটাকে একটা নারকেল গাছের সাথে বেঁধে প্রায় ঘন্টাখানেক সময় পিটিয়েছিল। পরদিন জানতে পারি ছেলেটি মারা গেছে"।

রংপুর বিভাগের কেন্দ্রীয় কারাগার ও একাধিক জেলা কারাগার সরেজমিনে পরিদর্শন ও দায়িত্বরত কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎের সময় এই বিষয়গুলো তুলে ধরে কারাগার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে, তাদের প্রত্যেকেরই প্রতিকূলতার এবং সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করেন। কারাগারগুলোতে ধারণসংখ্যার অতিরিক্ত কয়েদি ও হাজতিদের রাখতে হয়। এই বিশাল সংখ্যক কারাবন্দীর জন্য মাত্র একজন ডাক্তার যুক্ত থাকেন বলে তারা জানান। কারা হাসপাতাল উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। ফলে, কারাবন্দীদের চিকিৎসার জন্য বাহিরে সদর হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। তাছাড়া, কারাবন্দীদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য এখানে কোন মাধ্যম খুঁজে পাওয়া যায়নি। ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন ও সরেজমিন পরিদর্শনে জানা গেছে যে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য এখানে কোন ধরনের বাদ্যযন্ত্রের ব্যবস্থা নেই। মাঝে মাঝে জাতীয় প্রোগ্রামগুলোতে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বাহির থেকে শিল্পী এনে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। কারাগারগুলোতে নিম্নমানের খাবার সরবরাহ করা হয়। যার ফলে কারাবন্দীরা প্রায় বিভিন্ন ধরনের শারীরিক অসুস্থতায় ভোগে থাকেন। কারাবন্দীদের অবসর সময় কাটানোর জন্য টিভি আছে, তবে প্রায়শই সেটি নষ্ট পড়ে থাকে। খেলাধুলা করার জন্য ব্যাডমিন্টন ব্যাট আছে কিন্তু কর্ক নেই। কেরাম খেলার জন্য ক্যারামবোর্ড আছে কিন্তু গুটি নেই।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়: বিশ্বব্যাপী প্রচলিত কারানাট্যের মডেল পর্যালোচনা

থম্পসন (১৯৯৮) বলেন, "কারানাট্যের বিকাশের সুস্পষ্ট নথিভূক্ত ইতিহাস নেই। তবে 'উল্লেখযোগ্য মূহুর্ত' রয়েছে যা প্রিজন থিয়েটার এর অগ্রগতির সাথে যুক্ত হতে পারে" (পৃ. ৬)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৫০ এর দশকে সান কুয়েন্টিন স্টেট জেলে 'সান কুয়েন্টিন ড্রামা ওয়ার্কশপ' দেশটির প্রথম কারা নাটকের উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল (ম্যাকঅ্যাভিনচে, ২০১১)। গবেষক টকি (২০০৭) এর মতে, ১৯৬০ ও ৭০-এর দশকে বিশ্বব্যাপী কারানাট্যের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উদাহরণ তৈরি হতে শুরু করে। নিম্নে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পরিচালিত কারানাট্য থেকে বাছাইকৃত ৩টি কারানাট্য প্রকল্পের কাঠামো ও কর্মপ্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা মডেল

১৯৯৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার 'পোলসমুর ভর্তি কেন্দ্র' ও 'সেন্টার ফর কনফ্লিক্ট রেজুলেশন (সিসিআর)'-এর যৌথ উদ্যোগে প্রিজন ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট শুরু হয়। নির্দেশনার মাধ্যমে বন্দীদের সাথে যোগাযোগ ও দমনমূলক শাসন পদ্ধতি পোলসমুর ভর্তি কেন্দ্রের কারাগার ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। শারিরীক সহিংসতা, মৌখিক হুমকির মত দমনমূলক পদ্ধতি গ্রহণ করার দরুণ উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হতো। এরই প্রেক্ষিতে 'সেন্টার ফর কনফ্লিক্ট রেজুলেশন (সিসিআর)' ১৯৯৮ সালে 'কনফ্লিক্ট রেজুলেশন ওয়ার্কশপ' এর মাধ্যমে কারাগারে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। বন্দীদের প্রতি কারাকর্মীদের দমনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেরিয়ে এসে মানবাধিকারকে গুরুত্ব দিয়ে মানুষকে সম্মান ও মর্যাদার সাথে দেখার বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া হয়। "চ্যালেঞ্জিং হলেও 'ইন্টারেক্টিভ পদ্ধতি' অংশগ্রহণকারীদের উপর প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী প্রভাব ফেলে" (বালফোর, ২০০৪, পৃ. ১৬৮)। এ্যাকশন লার্নিং মডেলের উপর

Dhaka University Institutional Repository

ভিত্তি করে তৈরি হওয়া ইন্টারেক্টিভ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণের স্থানের বৈচিত্র রাখার চেষ্টা করা হয়। "সেন্টার ফর কনফ্লিক্ট রেজুলেশন (সিসিআর)'-এর প্রশিক্ষণে ৩ ধরণের প্রশিক্ষণ স্থান ব্যবহার করা হয়" (বালফোর, ২০০৪, পৃ. ১৬৮)। এর ১টি হলো, প্রাথমিক ও আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের জন্য বৃত্তাকার বা অর্ধ-বৃত্তাকার একটি স্থান যা মিথস্ক্রিয়ার উপযোগী। ২য় স্থানটি হলো, মূল বন্দীশালার বাইরে এমন এক উন্মুক্ত স্থান যেখানে ইন্টারেক্টিভ গেইম বা অনুশীলন করা যায়। এবং ৩য় স্থানটি হলো, ফ্যাসিলেটেটর দ্বারা তৈরিকৃত একটি 'পবিত্র বৃত্ত' যেখানে অংশগ্রহণকারীদের গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে উপজীব্য করে 'সেন্টার ফর কনফ্লিক্ট রেজুলেশন (সিসিআর)' তাদের কর্মশালা পরিচালনা করতো যা তাদের অভিজ্ঞতায় বেশ ফলপ্রসু ছিল। এক্ষেত্রে মূল লক্ষ্যই ছিল, দ্বন্দ্ব নিরসন এবং এজন্যে নেতিবাচক থেকে ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য একটি নির্দিষ্ট থিম নির্ধারণ করা হতো। "সেন্টার ফর কনফ্লিক্ট রেজুলেশন (সিসিআর)' কর্মশালায় একটি অনবদ্য অভিজ্ঞতা হলো যে, একটি নির্দিষ্ট থিমসহ একটি কর্মশালা পরিচালনা করা" (বালফোর, ২০০৪, পৃ. ১৭২)। অর্থাৎ, একটি নির্দিষ্ট থিমে বৈচিত্রময় প্রশিক্ষণ ও পরিবেশনার স্থানে কর্মশালা পরিচালনা করে নেতিবাচক থেকে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন করতে সমর্থ হয়েছিল 'সেন্টার ফর কনফ্লিক্ট রেজুলেশন (সিসিআর)'।

ব্রাজিল মডেল

ডারবানের ওয়েস্টভিল প্রিজন ম্যানেজমেন্ট এরিয়াতে পুরুষদের জন্য সর্বোচ্চ সুরক্ষা কারাগার মিডিয়াম বি-তে এমবোঙ্গেসেনি বুথেলেজি কাজ করেন। তিনি মিডিয়াম বি-তে নাটক নির্মাণের লক্ষ্যে থিয়েটার ওয়ার্কশপ কৌশল প্রয়োগ করেন। তিনি ৬ জন বন্দীকে সহায়তাকারী হিসেবে যুক্ত করে ২৫০ জন বন্দীর একটি দলকে নিয়ে কাজ করেন। বুথেলেজির পরামর্শক্রমে তার দুইজন ছাত্র প্রতিদিন ২ ঘন্টা করে ৮ দিন

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপী ওয়ার্কশপ পরিচালনা করেন। ওয়ার্কশপ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে ৭টি সেশনে একটি পারফরম্যান্স তৈরী করা হয়। যার মূল বিষয় ছিল, "কিভাবে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা কারাগারে এইচআইভি/ এইডসের সাথে ইতিবাচকভাবে জীবনযাপন করা যায়। পুরো পারফরম্যান্সটি ৪টি বিভাগ নিয়ে গঠিত" (বুথেলেজি ও হার্স্ট, ২০০৩, পৃ. ১২৬)। প্রথম বিভাগটি ছিলো দর্শকের প্রস্তুতি। দ্বিতীয় বিভাগে ছিলো একটি ছোট নাটক। তৃতীয় বিভাগে আলোচনা এবং চতুর্থভাগে সমাপ্তি। এইচআইভি/এইডসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রতি কুসংস্কারের অভিব্যক্তি চিহ্নিতকরণ এবং আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের প্রস্তাবনা তৈরী করার মধ্য দিয়ে শেষ হয় ১ঘন্টা ৫০ মিনিট ব্যাপী পারফরম্যান্সটি।

বুথেলেজির পারফরম্যান্স স্পেসের ২টি দিক রয়েছে। ১ম দিকটি হলো, একটি পাবলিক স্পেস তৈরী করা যেখানে। অভিনেতা-ফ্যাসিলিটেটর ও দর্শক একত্রে থাকতে পারে। ক্রিস্টোফার কামলঙ্গেরা (১৯৮৮)-এর মতে, "বাস্তবজগৎ এবং থিয়েটারের মধ্যে সহাবস্থানের একটি ক্ষেত্র রয়েছে" (পৃ. ২২-২৩)। বুথেলেজির পারফরম্যান্স স্পেসের দ্বিতীয় দিকটি হলো, পারফরম্যান্স স্পেসের নমনীয়তা। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে বড় দলটিকে আলোচনার জন্য ছোট ব্যক্তিগত দল তৈরি করা হয়। "কারাগারের প্রেক্ষাপটে ক্ষমতার শ্রেণিবিন্যাস জনগণের সমালোচনামূলক বিতর্ক কমিয়ে দিতে পারে" (বুথেলেজি ও হার্স্ট, ২০০৩, পৃ. ১২৭)। এজন্য এরকম ছোট ছোট দল তৈরি করা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

চীন মডেল

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন 'পারফর্মিং আর্টস সেন্টার অফ সিটি এ (পিএসিএ)'-এর সাথে একজন পিএইচডি গবেষক ২০০৬ সালে সমন্বিতভাবে 'এ' শহরের কারাগারে কারানাট্য সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

ফোকাসড-এথনোগ্রাফি ও অটো-এথনোগ্রাফির মাধ্যমে এই কারানাট্যের কাঠামোটি তৈরি করা হয়েছিল মূলত, "চীনা কারাগারের সামাজিকীকরন প্রক্রিয়ার পদ্ধতি অন্বেষণের জন্য" (ঝ্যাং, ২০১৭, পৃ. ২৯৯)।

সেল, ব্লক বা ক্যান্টিনে যাওয়ার সুযোগ না থাকায়, এমনকি ওয়ার্কশপ করার অনুমতি না থাকায় নৃতাত্ত্বিকভাবে পঞ্চইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপায়ে কারানাট্যের প্রস্তুতি চলে। কারাগারে বিচরণ সীমিত থাকায় "ফোকাসড-এথনোগ্রাফিক পদ্ধতি সবচেয়ে উপযুক্ত হবে, যা নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতির চেয়ে কম নিমজ্জিত" (ঝ্যাং, ২০১৭, পৃ. ৩০২)। নির্দিষ্ট কালব্যাপী প্রতি বুধবার সকাল সাড়ে ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত নথি দেখা, বন্দী ও অফিসারদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার মধ্য দিয়ে পদ্ধতিটি পরিচালিত হয়।

অটো-এথনোগ্রাফি, গবেষকের আত্মজীবনীমূলক প্রতিফলন গবেষণাটির একটি অনিবার্য অংশ ছিল। "অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণ (নিম্নস্তরের অংশগ্রহণ), অংশগ্রহণমূলক কর্ম গবেষণা/ অনুশীলনের নেতৃত্বে গবেষণা (উচ্চস্তরের অংশগ্রহণ), অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণ (মাঝারি স্তরের অংশগ্রহণ) এবং শেষ দুই সপ্তাহে, নিম্নস্তরের অংশগ্রহণকারীদের কাছে ফিরে যাওয়ার" (ঝ্যাং, ২০১৭, পৃ. ৩০৫) মাধ্যমে কারাগারে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার পদ্ধতি অন্বেষণ করা হয়েছিল। এই কাঠামোতে কারানাট্য পরিচালিত হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়: কয়েদি জীবনের নাট্যিক রূপায়ন: কারানাট্যের নন্দনতত্ত্ব অন্বেষণ

বর্তমান গবেষণার প্রথম অধ্যায়ে উপস্থাপিত প্রাথমিক উপাত্ত ও তার বিশ্লেষণ আমাদের সামনে কারাবন্দীদের সংকটসমূহের একটি প্রামাণ্যচিত্র উপস্থাপন করে। এইসকল সামাজিক-রাজনৈতিক-প্রশাসনিক-বিচারিক-মনস্তাত্ত্বিক-শারীরবৃত্তিক সংকটসমূহ দূর করা সম্ভব না হলে, কারাগারের উদ্দেশ্য তথা সংশোধন সম্ভবপর নয়। 'রাখিব নিরাপদ, দেখাব আলোর পথ' মূলমন্ত্রে দীক্ষিত বাংলাদেশ কারাগারের সংশোধন ও অপরাধ প্রবণতা হ্রাস করার যেই উদ্দেশ্য, তা সাবেকী ধরণের দমনমূলক কারাগার ব্যবস্থায় অর্জন করা সম্ভব হবে না। গবেষণার সাহিত্য পর্যালোচনা এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিশ্বব্যাপী কারানাট্যের মডেল বিশ্লেষণ অংশ কারানাট্যচর্চাকে সংশোধনাগার নির্মাণের সহায়করূপে প্রমাণ করে।

১৯৭৫-২০২৩ সময়কালে বাংলাদেশের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও জেলা কারাগারে কয়েদি বা হাজতি হিসেবে ছিলেন এমন ব্যক্তিদের নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশনের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করে আমরা দেখেছি যে, তাদের প্রত্যেকেই কোন না কোন সংকটের মুখে পতিত হয়ে কারাবন্দী হয়েছেন, কারাবাস করছেন/করেছেন এবং কারাজীবন শেষেও সংকটের মুখোমুখি হচ্ছেন। কারাবন্দীরা পেশাগত, জমি সংক্রান্ত জটিলতা, পারিবারিক ও সামাজিক সংকট, রাজনৈতিক জটিলতা, মাদক-অপহরণ-চোরাকারবার ইত্যাদি বহুবিধ সংকটের দরুণ অপরাধ সংগঠিত করে অথবা অপরাধ সংগঠনের দায়ে কারাবরণ করেছেন। বন্দী এইসকল মানুষদের অনেকেই মিথ্যা মামলায় কারাভোগ করছেন বা বিচারের অপেক্ষায় হাজতবাস করছেন। কারাভোগকারীর পরিবার ও স্বজনরাও ব্যক্তির কারাভোগের কারণে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে নিগ্রহের শিকার হয়েছেন। কারাভোগ পরবর্তী সময়ে অংশগ্রহণকারীদের কেউই 'স্বাভাবিক সামাজিক জীবনে' ফেরত যেতে পারেন না। সমাজ তাদের গায়ে অপরাধী আখ্যা লেপে দেয়, যা তাকে

Dhaka University Institutional Repository

সংশোধনের পরিবর্তে আরো অপরাধী করে তোলে। যা অত্যন্ত বি-মানবিক। ফলে একজন কারাবন্দী মানুষের অপরাধ প্রবণতা হ্রাস করার লক্ষ্যে অপরাধের সাথে সংযুক্ত বা সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রাক-কারাজীবন, কারাজীবন ও কারাগার-পরবর্তী জীবনের সংকটগুলোও চিহ্নিত করা জরুরী। সংকট চিহ্নিত করে- ক) প্রাক-কারাবাসের ঘটনাপ্রবাহ, খ) কারাবাসকালীন ও কারাবাস পরবর্তী সময়ে কারাবন্দী ও তার পরিবারের সংকট এবং গ) অপরাধের প্রভাবকসমূহ নিয়ে নাট্য নির্মাণ জরুরী।

নাট্য নির্মাণের লক্ষ্যে অংশগ্রহণকারী অভিনেতাদের সাথে নিয়ে কাঠামো নির্ধারণ জরুরী। নাট্যের কাঠামো, নাট্য নির্মাণের পদ্ধতি বিষয়ক আলোচনা আমরা ২য় অধ্যায়ে পেয়েছি। বিশ্বের ৩টি মডেল বিশ্লেষণ করে আমরা বুঝতে পেরেছি, পঞ্চইন্দ্রিয়গ্রাহ্যভাবে তথ্য-উপাত্ত আহরণ, পারফরম্যান্স স্পেসের বৈচিত্র আনয়ন ও পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে নাট্য নির্মাণ করা হলে দর্শককে কর্তাস্বত্তায় পরিণত করা এবং দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে সংলাপ সম্ভব। এভাবে সংলাপের মাধ্যমে সংকটকে চিহ্নিত ও উত্তরণের উপায় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব হবে। কেবল তখনই অপরাধ প্রবণতা হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে।

থিয়েটারকে ভাষা বা যোগাযোগের মাধ্যমরূপে তৈরী করতে হলে, অভিনেতাকে শারিরীক কসরত, ইন্টারেক্টিভ গেম ও অনুশীলনের মাধ্যমে নিজের শরীরকে জানা এবং আরো প্রকাশযোগ্য করে তুলতে হবে। অগাস্তো বোয়াল একেই বলেছেন, শরীরকে জানা ও প্রকাশযোগ্য করে তোলার অনুশীলন করা।

নিজ শরীরকে জানা ও আরো প্রকাশযোগ্য করে তোলার পর ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে দলগতভাবে নিজেদের জীবনের সংকটগুলোকে নিয়ে পান্ডুলিপি তৈরী করতে হবে এবং উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ইমেজ থিয়েটার বা ফোরাম থিয়েটারের আঙ্গিক গ্রহণ করলে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে সংলাপ করা সম্ভব হবে। এর সাথে

Dhaka University Institutional Repository

কারানাট্যে দেশজ শিল্পকলার বিভিন্ন (যেমন- পালাগান, জারি-সারি, পুঁথি বা অঞ্চলভিত্তিক গীতশৈলী, নৃত্য) আঙ্গিকের প্রয়োগ সহায়ক ভূমিকা রাখব।

বোয়াল (২০০৮) বলেন, থিয়েটারকে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যকার যোগাযোগের ভাষায় পরিণত করা গেলেই কেবল, জীবনে ঘটতে থাকা সংকটগুলোকে চিহ্নিত করা যায় এবং সংলাপের মাধ্যমে এর থেকে উত্তরণ বা মুক্তির পথ তৈরী হয়। সংকট চিহ্নায়ণই মূলত মুক্তির প্রাথমিক শর্ত। তাইতো বোয়াল বলেন, "নিপীড়িতের নন্দনতত্ত্ব আবশ্যিকভাবেই মুক্তির নন্দনতত্ত্ব" (পৃ. ১৩৫)। একইভাবে, কারাগারের বি-মানবিকীকরণ প্রক্রিয়ার কারণে সংকটাপন্ন ব্যক্তিগন কারানাট্যের মাধ্যমে তাদের সংকট নিয়ে সংলাপে অবতীর্ণ হন। ফ্রেইরে (২০০৫) বলেন, সংলাপের আশ্রয় নিয়ে তারা মানবিকীকরণের প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত হন। যা তাদের মুক্তির পথে অগ্রসর করে। মুক্তির এই পথযাত্রার মাধ্যমেই কারানাট্যের নন্দনতত্ত্ব তৈরি করে। অর্থাৎ, কারানাট্যের দ্বারা মানবিকীকরণের প্রক্রিয়াই কারানাট্যের নন্দনতত্ত্ব। সুতরাং, বাংলাদেশের কারানাট্যের নন্দনতত্ত্বের হদিশ পেতে হলে দর্শক-অভিনতার সংলাপ আশ্রিত পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে কয়েদি জীবনের নাট্যিক রূপায়ন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

বর্তমান গবেষণার ১ম অধ্যায়ে উপস্থাপিত মাঠ পর্যবেক্ষণের তথ্য বিশ্লেষণে স্পষ্ট হয় যে, বাংলাদেশের কারাগারগুলোর কারাবন্দীর প্রতি একধরনের দমনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। 'রাখিব নিরাপদ, দেখাব আলোর পথ' মূলমন্ত্রে দীক্ষিত বাংলাদেশের কারাগারের প্রেক্ষাপটে কয়েদী জীবনের নাট্যিক রূপায়নের আঙ্গিক কীরূপ হবে এবং তা কীভাবে কারাবন্দীদের কার্যকরভাবে মানবিকীকরণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত করবে তার অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে গবেষণাটিতে।

ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে দলগতভাবে কারাবন্দী মানুষের অপরাধ প্রবণতা হ্রাসের লক্ষ্যে অপরাধের সাথে যুক্ত বা সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রাক-কারাজীবন, কারাজীবন ও কারাগার-পরবর্তী জীবনের সংকটগুলোও চিহ্নিত করে- ক) প্রাক-কারাবাসের ঘটনাপ্রবাহ, খ) কারাবাসকালীন ও কারাবাস পরবর্তী সময়ে কারাবন্দী ও তার পরিবারের সংকট এবং গ) অপরাধের প্রভাবকসমূহ নিয়ে নাট্য নির্মাণ কার্যকরী।

পঞ্চইন্দ্রিয়গ্রাহ্যভাবে তথ্য-উপাত্ত আহরণ, পারফরম্যান্স স্পেসের বৈচিত্র আনয়ন ও পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে নাট্য নির্মাণ করা হলে দর্শককে কর্তাস্বত্তায় পরিণত করা এবং দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে সংলাপ এবং উত্তরণের উপায় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে, নাট্য উপস্থাপনের লক্ষ্যে আঙ্গিক হিসেবে ইমেজ থিয়েটার বা ফোরাম থিয়েটার ব্যবহার করা হলে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে সংলাপ কার্যকরী হবে। এক্ষেত্রে কারানাট্যে দেশজ শিল্পকলার বিভিন্ন আঙ্গিক (যেমন- পালাগান, জারি-সারি, পুঁথি বা অঞ্চলভিত্তিক গীত ও নৃত্যশৈলী) এর প্রয়োগ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। কেবল তখনই কারানাট্যের মাধ্যমে অপরাধ প্রবণতা হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে।

Dhaka University Institutional Repository

একই প্রসঙ্গে অগাস্তো বোয়াল (২০০৮) বলেন, নিপীড়িত মানুষকে সক্রিয় কর্তাস্বত্তায় রূপান্তর এবং ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক সংকটকে সমাধানের লক্ষ্যে সংলাপ আয়োজনের জন্য নাটককে ভাষা বা যোগাযোগ মাধ্যমরূপে প্রয়োগ করা যেতে পারে। সঙ্গত কারণেই, অপরাধীর মনস্তত্ত্বের ইতিবাচক পরিবর্তন ও অপরাধ হ্রাস করার উদ্দেশ্যে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যেকার সংলাপ নির্ভর নাট্যভাষার আশ্রয় নেওয়া কার্যকর উপায় হতে পারে। যা কারাগারকে সংশোধনাগার হিসেবে রূপান্তরিত করবে এবং কারানাট্য নান্দনিক রূপ লাভ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থাবলী

ইলিস, অ্যান্থনি (২০০৩)। Ellis, A. (2003). A Deterrence Theory of Punishment. *The Philosophical Quarterly (1950), 53*(212), 337–351. Retrieved on December 4, 2024 from http://www.jstor.org/stable/3543120

ইসলাম, রোজিনা (২০২৩, নভেম্বর ৮)। কারাগারে গাদাগাদি, ধারণক্ষমতার দ্বিগুণ বন্দী। *দৈনিক প্রথম আলো।* https://www.prothomalo.com/bangladesh/k86edrf91n#:~:text=স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান গত ২,৯০ হাজার বন্দী রাখতে পারব।

ওয়ালিম্যান, নিকোলাস (২০০৬)। Walliman, N. (2006). *Social Research Methods.* Sage Publications.

উইলকক্স, অ্যাগনেস (২০০৫)। Wilcox, A. (2005). Denmark Is a Prison and You Are There. *The Journal of the Midwest Modern Language Association, 38*(1), 116-122. Retrieved on December 4, 2024 from https://www.jstor.org/stable/30039305

কামলঙ্গেরা, ক্রিস্টোফার (১৯৮৮)। Kamlongera, C. (1988). *Theatre for Development in Africa with Case Studies from Malawi and Zambia.* Education Science and Documentation Centre.

কোফম্যান, আরনল্ড এস (১৯৬০)। Kaufman, A. S. (1960). The Reform Theory of Punishment. Ethics 71(1), 49–53. https://doi.org/10.1086/291314

Dhaka University Institutional Repository

কোহেন, ডেভিড (২০০৫)। Cohen, D. (2005). Theories of Punishment. In M. Gagarin & D. Cohen (Eds.), *The Cambridge Companion to Ancient Greek Law*. Cambridge University Press, pp. 170-190.

ঝ্যাং, ঝাউই (২০১৭)। Zhang, X. (2017) 'Prison Theatre as Method: Focused Ethnography and Auto-ethnography in a Chinese Prison', in S. Fletcher and H. White (eds) *Emerging Voices: Critical Social Research by European Group Postgraduate and Early Career Researchers*. London: EG Press Limited, pp. 295–309.

টকি, লরেন্স (২০০৭)। Tocci, L. (2007). *The Proscenium Cage: Critical Case Studies in U.S. Prison Theatre Programs*. Cambria Press.

থম্পসন, জেমস (১৯৯৮)। Thompson, J. (1998). *Prison Theatre: Practices and Perspectives (Forensic Focus).* Jessica Kingsley Publishers.

পরাঞ্জপী, এন. ভি. (১৯৯৬)। Paranjape, N. V. (1996). *Criminology and Penology* (9th Edition). Central Law Publication.

ফারিয়া, পুষ্প (তারিখবিহীন)। Fariya, P. (n.d.). Prison System of Bangladesh. *Academia.* Retrieved on December 4, 2024 from https://www.academia.edu/11653887/Prison_System_Of_Bangladesh

ফ্রেইরে, পাওলো (২০০৫)। Freire, P. (2005). *Pedagogy of the Oppressed.* Continuum. (Original work published 1968)

Dhaka University Institutional Repository

বালফোর, মাইকেল (২০০৪)। Balfour, M. (2004). *Theatre in Prison Theory and Practice.* Intellectual Ltd.

বুথেলেজি, বঙ্গিসিনি, ও হার্স্ট, ক্রিস্টোফার (২০০৩)। Buthelezi, M., & Hurst, C. (2003). A Brazilian theatre model meets Zulu performance conventions Westville prison - the case in point. *Current Writing: Text and Reception in Southern Africa, 15*(1), 123–134. https://doi.org/10.1080/1013929X.2003.9678147

বোয়াল, অগাস্তো (২০০৮)। Boal, A. (2008). *Theatre of the Oppressed.* Pluto Press. (Original work published 1974)

ব্রাইম্যান, অ্যালান, ও বেল, এডওয়ার্ড (২০১৯)। Bryman, A., & Bell, E. (2019). *Social Research Methods (5th ed.).* Oxford university press

মুলার, লরেন (২০০৩)। Moller, L. (2003). A Day in the Life of a Prison Theatre Program. *The Drama Review (1988-), 47*(1), 49-73. Retrieved on December 4, 2024 from https://www.jstor.org/stable/1147029

ম্যাকঅ্যাভিনচে, কিভা (২০১১)। McAvinchey, C. (2011). *Theatre & Prison.* Palgrave Macmillan.

ম্যাককামিস, মাইকেল ডি (২০০৪)। McCamish, M. D. (2004). *The Theatre of Prison: Power and Resistance, Family and Production of Illegality, Starring the California Department of Correction* [Doctoral dissertation, California Institute of Integral Studies]. Rage University. Retrieved on December 4, 2024 from

Dhaka University Institutional Repository

http://rageuniversity.com/PRISONESCAPE/PRISON RESISTANCE/PRISONPOWERANDRESISTANCE.pdf

রায়ান, পল রাইডার (১৯৭৬)। Ryan, P. (1976). Theatre as Prison Therapy. *The Drama Review, 20*(1), 31-42. https://doi.org/10.2307/1145035

রেইড, সু তিতাস (১৯৯৭)। Reid, S. T. (1997). *Crime and Criminology* (8th Edition). McGraw-Hill Boston.

লিকম্তে, মার্গারেট ডি, ও স্কেনশোল, জ্যঁ জে (২০১০)। LeCompte, M. D., & Schensul, J. J. (2010). *Designing & conducting ethnographic research: an introduction.* Second edition. Lanham, Maryland, AltaMira Press.

লুইস, ডেভিড উইলিয়ামস (২০১৯)। Lewis, D.W. (2009). *From Newgate to Dannemora: The Rise of the Penitentiary in New York, 1796–1848*. Cornell University Press.

শেইলর, জোনাথান (২০১০)। Shailor, J. (2010). *Performing New Lives: Prison Theatre*. Jessica Kingsley Publishers.

হেলমোর, এডওয়ার্ড (২০১৬, জানুয়ারি ৩)। Helmore, E. (2016, January 3). Beckett's prison protege: the inmate who became a top interpreter of writer's work. *The Guardian*. Retrieved on December 4, 2024 from https://www.theguardian.com/culture/2016/jan/03/samuel-beckett-prison-rick-cluchey-inmate